সাবধান! তোমরা ঐরূপ করিবে না– আমি কঠোরভাবে তাহা নিষেধ করিয়া যাইতেছি।

নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অন্তিমকালের এই অছিয়ত-উপদেশ এই যুগের উম্মতগণ যেইভাবে লঙ্ঘন করিতছে তাহা দেখিলে শরীর শিহরিয়া উঠে।

নবীজীর (সঃ) সর্বশেষ বচন (পৃঃ ৬৪১)

১৭৪৫। হাদীছ ঃ عن عائشة رضى الله تعالى عنها قَالَتْ وَكَانَتْ اٰخِرُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا ؛ اَللّٰهُمَّ الرَّفِيْقَ الْاَعْلٰى -

অর্থ ঃ আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মুখে উচ্চারিত সর্বশেষ বচন ছিল– "আল্লাহুম্মার রফীকাল আ'লা" –হে আল্লাহ আমার পরম সুহৃদ! (তোমার মিলন চাই।)

কালোমা তাইয়্যেবা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"-এর যে মর্ম– তওহীদ বা একাত্ববাদ তাহা সম্পূর্ণরূপে এই বাক্যে নিহিত রহিয়াছে। এই বাক্যের মর্ম হইল– একমাত্র আল্লাহ তাআলাকেই চাই; আমার লক্ষ্য একমাত্র তাঁহারই প্রতি । (যোরকানী, ৮– ২৮২)

কালেমা তাইয়্যেবার মর্ম– এক আল্লাহর প্রতি লক্ষ্য নিবদ্ধ করা, ইহার বিকাশ এই বাক্যে অতি উচ্চাঙ্গ পর্যায়ে রহিয়াছে। কারণ, ঐ মর্ম কালেমা তাইয়্যেবাতে আছে শুধু স্বীকৃতি পর্যায়ে, আর এই বাক্যে তাহা রহিয়াছে মহব্বত প্রেমের বন্ধন পর্যায়ে। "রফীকাল আ'লা"-এর অথ পরম বন্ধু, পরম সুহৃদ, পরম প্রিয়, পরম প্রেমাস্পদ– আল্লাহ; একমাত্র তাঁহার মিলন কামনা করি।

নবীজী মোস্তফা (সঃ) "হাবীবুল্লাহ" আল্লাহর প্রিয়পাত্র। তিনি সারা জীবন এই স্বীকৃতি আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে লাভ করিয়াছিলেন। এখন জীবনের সর্বশেষ প্রান্তে সেই আল্লাহর সান্নিধানে পৌঁছিবার শুভ মুহূর্তে তাঁহাকে তিনি পরম বন্ধু, পরম সুহৃদ নামে ডাকিলেন এবং বরণ করিলেন; ইহা কতই না সামঞ্জস্য পূর্ণ।

নবীজী (সঃ) অন্তিম অবস্থায় বারংবার অচেতন হইয়া পাড়িতেছেন। প্রত্যেকবার চৈতন্য লাভের সঙ্গে সঙ্গে ঐ বাক্য বলিয়া উঠিতেন। শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গেও পবিত্র জবান হইতে শেষ বাণী তাহাই উচ্চারিত হইত এবং সেই বাক্যের মর্মানুযায়ী তাঁহার পবিত্র আত্মা পরম সুহৃদ আল্লাহ তাআলার সন্নিধানে মহাপ্রস্থান করিল। اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ - وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ -

বিবি আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবীজীর পবিত্র আত্মার মহাপ্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে এমন সুগন্ধি ছড়াইয়া পড়িল যাহা জীবনে কোন সময় লাভ হয় নাই।

বিবি উম্মে সালামা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছিলেন, নবীজীর মহাপ্রস্থানের দিন আমি একবার তাঁহার পবিত্র বক্ষের উপর হস্ত স্পর্শ করিয়াছিলাম; আমার হাতে এমন সুগন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল যে, দীর্ঘ দিন পর্যন্ত অযু গোসলে ধোয়া-মোছা সত্ত্বেও আমার হস্তে কস্তুরীর সুগন্ধি পাওয়া যাইত। (বোদায়া, ৪- ২৪১)

অন্তিম শয্যায় নবীজীর বিভিন্ন ভাষণ

শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের চারি দিন পূর্বে বৃহস্পতিবার দিন যোহর নামাযান্তে মসজিদের মিম্বরে আরোহণপূর্বক নবীজী (সঃ) যে ভাষণ দিয়াছিলেন তাহাই ছিল তাঁহার বিদায়কালীন প্রসিদ্ধ এবং প্রকাশ্যভাবে সর্বসাধারণ সমক্ষে শেষ ভাষণ। এই ভাষণে নবী (সঃ) অনেক বিষয়ই বয়ান করিয়াছিলেন এবং

তাহা অংশ অংশরূপে বিভিন্ন হাদীছে বর্ণিত আছে। যথা– মিম্বরে আরোহণের পূর্বে সর্বপ্রথম নবীজী (সঃ) ওহুদ জেহাদের শহীদানদের জন্য বিদায়ী হৃদয়ের সমুদয় ভাবাবেগ ঢালিয়া দোয়া করিলেন। (১ম খণ্ড; ৬৯৯ হাদীছ দ্রষ্টব্য)

অতপর মিম্বরে আরোহণপূর্বক প্রথম তাঁহার ইহজগত ত্যাগ ও পরপারে যাত্রা করার কথা ব্যক্ত করিলেন। কিন্তু নিজের নাম প্রকাশ না করিয়া অনির্দিষ্ট কোন এক ব্যক্তির বিষয়রূপে প্রকাশ করিলেন। ফলে জন সাধারণ বুঝিতে পারিল না যে, নবীজী (সঃ) অচিরেই আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইবেন; কিন্তু আবু বকর (রাঃ) বিষয়টি ভালভাবেই বুঝিতে পারিলেন এবং তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। আবু বকরের ক্রন্দনে নবীজী (সঃ) অত্যন্ত অভিভূত হইলেন; তাঁহাকে সান্ত্বনা দিলেন এবং নবীজীর জন্য তাঁহার অসাধারণ ত্যাগ, দান ও সেবার স্বীকৃতি দানপূর্বক তাঁহার প্রতি গভীর ভালবাসা প্রকাশ করিলেন। (১৭২৩ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য)

অতপর সুস্পষ্ট ভাষায় সকলকে সম্বোধনপূর্বক বলিলেন, আমি তোমাদিগকে ছাড়িয়া অগ্রগামীরূপে আখেরাতের মঞ্জিলে চলিয়া যাইতেছি। আল্লাহর দরবারে আমি তোমাদের জন্য সাক্ষী হইব। হাউজে কাওসারে আমার সঙ্গে তোমাদের সাক্ষাতের ওয়াদা রহিল। হাউজে কাওসার (বাস্তব, সৃষ্ট) এখনও আমি দেখিতেছি। আমাকে সমগ্র ধন-ভাণ্ডারের চাবি দিয়া দেওয়া হইয়াছে; (অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের উপর মুসলমানদের আধিপত্য হইবে,) আমি এই ভয় আর করি না যে, আমার তিরোধানের পর তোমরা শেরক বা অংশীবাদে লিপ্ত হইবে। তবে আমার এই ভয় হয় যে, তোমরা দুনিয়ার ধন-দৌলত, জাঁকজমক ও আরাম-আয়েশের প্রতি অতিশয় ঝুঁকিয়া পড়িবে– প্রতিযোগিতামূলকভাবে তাহাতে লিপ্ত ও মত্ত হইবে। ফলে দুনিয়া তোমাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিবে যেরূপ তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে ধ্বংস করিয়াছে।*

কবর পূজা সম্পর্কে সতর্ক করিয়া নবী (সঃ) বলিলেন, খৃস্টান-ইহুদীদের প্রতি আল্লাহর লা'নত অভিশাপ বর্ষিত হইয়াছে; তাহারা তাহাদের পীর পয়গম্বরগণের করবকে সেজদা করিয়াছে। আমি তোমাদিগকে কঠোরভাবে নিষেধ করিতেছি, খবরদার তোমরা ঐরূপ করিবে না, আমর কবরকেও তোমরা পূজা করিবে না। (১ম খণ্ড ২৭৮, ১৭২৫ হাদীছ দ্রঃ

ইসলামের জন্য মদীনাবাসী আনসারগণের জান-মাল সর্বস্ব ত্যাগের স্বীকৃতি দানে নবীজী (সঃ) তাঁহাদের সম্পর্কে বলিলেন– আনসারগণ আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং ব্যক্তিগত সর্বময় সম্পর্কের অধিকারী। তাঁহারা তাঁহাদের দায়িত্ব পূর্ণরূপে আদায় করিয়া দিয়াছে, তাঁহাদের প্রাপ্য বাকী রহিয়াছে। তাঁহাদের ভাল কাজের স্বীকৃতি দিবে এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি হইতে দৃষ্টি এড়াইয়া চলিবে, ক্ষমা করিবে।

আমি মুহাম্মদের (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) উম্মতের যেকোন ব্যক্তি কাহারও ক্ষতি বা উপকার করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইবে তাহার প্রতি আমার বিশেষ নির্দেশ– সে যেন আনসারগণের ভাল কাজের স্বীকৃতি দেয় এবং তাঁহাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি হইতে দৃষ্টি এড়াইয়া চলে। (১৭২৬ নং ১৭২৭ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য)

নবম হিজরী সন হইতে সমগ্র আরব উপদ্বীপকে ইসলামের কেন্দ্ররূপে গড়িয়া তোলার জন্য তথা হইতে মোশরেক-পৌত্তলিকদের উচ্ছেদ সাধনের যে অভিযান আল্লাহ তাআলার বিশেষ নির্দেশে আরম্ভ করা হইয়াছিল– সেই অভিযান চালাইয়া যাওয়ার নির্দেশ দানে নবীজী (সঃ) বলিলেন, সমগ্র আরব উপদ্বীপের সীমানা হইতে মোশরেক-পৌত্তলিকদেরকে বহিষ্কার করিয়া দিবে। আর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সৌহার্দ্য বজায় রাখিবে। রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিবর্গকে উপহার দেওয়ার যে নীতি আমার ছিল, সেই নীতি তোমরাও অনুসরণ করিয়া চলিবে। (১৭২৮ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য)

নবীজী (সঃ) আরও বলিলেন, হে লোকসকল! আমি শুনিতে পাইয়াছি, তোমরা তোমাদের নবীর মৃত্যুর ভাবনায় আতঙ্কিত! বল ত! আমার পূর্বে কোন নবী তাঁহার উম্মতের মধ্যে চিরদিন রহিয়াছেন কি? তাহা

* প্রথম খণ্ডের ৬৯৯ নং হাদীছ যাহা মূল কিতাবে ১৭৯ ও ৫৭৬ পৃষ্ঠায় রহিয়াছে, কিছু অংশ মেশকাত শরীফ ৫৪৭ পৃষ্ঠায় আছে।

হইলে আমিও চিরদিন থাকিতে পারিতাম। সত্যই– আমি আমার প্রভু-পরওয়ারদেগারের সন্নিধানে চলিয়া যাইব। তোমরাও তাঁহার সন্নিধানে যাইবে।

আমি তোমাদের বিদায়ী উপদেশ দিতেছি– তোমরা ইসলামের জন্য সর্বস্বত্যাগী মোহাজেরদের মর্যাদার প্রতি সচেতন থাকিও। মোহাজেরগণকেও আমি উপদেশ দেই, তাঁহারা যেন নিজ নিজ অবস্থার সংশোধন করিয়া সৎ-সাধু হয়। আল্লাহ তাআলা (সূরা আছরের মধ্যে) বলিয়াছেন, মানুষ ধ্বংসের সম্মুখীন; একমাত্র তাহারা ব্যতীত যাহারা ঈমান বজায় রাখে এবং নেক আমলসমূহ সম্পাদন করিয়া চলে, আর সৎ পথে এবং সত্যের উপড় দৃঢ়পদ থাকার প্রতি মনোযোগী ও আহ্বানকারী হয়। সব কাজই আল্লাহর আদেশে হইয়া থাকে। অতএব কোন কাজে বিলম্ব হইলে ব্যতিব্যস্ত হইও না। কাহারও ব্যতিব্যস্ততায় আল্লাহ ব্যতিব্যস্ত হইবেন না। আল্লাহ সকলের উপর প্রবল, আল্লাহর উপর কেহ প্রবল হইতে পারে না। আল্লাহর প্রতি চালবাজি করিলে আল্লাহ তাহাকে উহার পরিণাম ভোগাইবেন।

তোমরা যদি ইসলামের শিক্ষা হইতে বিরাগী হও তবে তোমাদের দুনিয়ারও বিপর্যয় ঘটিবে এবং পরস্পরের সৌহার্দ্য বিনষ্ট হইবে। মদীনাবাসী আনসারদের প্রতি উত্তম ব্যবহারের উপদেশ দিতেছি। তাহারা তোমাদের পূর্ব হইতেই মদীনার অধিবাসী এবং অতি যত্নের সহিত ঈমান গ্রহণ ও বরণকারী। তোমরা তাহাদের প্রতি সদয় থাকিও। তাহারা তাহাদের জায়গা জমির উৎপন্ন বণ্টন করিয়া তোমাদের সমান ভোগ দান করিয়াছে, বাড়ী-ঘরে স্থান দান করিয়াছে, নিজেরা অনাহারী থাকিয়াও তোমাদেরকে অগ্রগণ্য করিয়াছে। তাহাদিগকে তোমরা পিছনে ফেলিও না।

আমি তোমাদেরই অগ্রগামী ব্যবস্থাপকরূপে পরকালীন জগতের প্রতি চলিয়া যাইতেছি; পরে তোমরা আমার সঙ্গে মিলিত হইবে। হাউজে কাওসারের কূলে আমার নিকট উপস্থিত হওয়ার যদি আকাঙ্ক্ষা থাকে তবে স্বীয় মুখ এবং হাতকে অবাঞ্ছিত কার্যাবলী হইতে বিরত রাখিবে।

হে জনমণ্ডলী! আল্লাহ তাআলার নাফরমানী তাঁহার দেওয়া নেয়ামতসমূহ পরিবর্তিত করিয়া দেয়। মনে রাখিও! জনসাধারণ সৎ, নেককার ও ভাল হইলে শাসনকর্তাগণও সৎ-সাধু, ভাল হইবে। আর জনসাধারণ ফাসেক-ফাজের হইলে তাহাদের শাসনকর্তা তাহাদের অশান্তি আনয়নকারী হইবে। (যোরকানী, ৮–২৬৮)

তুলনাহীন একটি আদর্শ ভাষণ

ফজল ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁহার অন্তিম শয্যায় একদা ভীষণ জ্বর অবস্থায় মাথায় পট্টি বাঁধিয়া আমার নিকট আসিলেন এবং বলিলেন, হে ফজল! তুমি আমাকে হাতে ধরিয়া নিয়া চল! সেমতে আমি হাতে ধরিয়া তাঁহাকে নিয়া চলিলাম; তিনি মিম্বরের উপর যাইয়া বসিলেন এবং বলিলেন, হে ফজল! লোকদের নামাযে উপস্থিত হওয়ার ডাক দাও। আমি "নামাযের জন্য আস" বলিয়া ধ্বনি দিলাম; জনগণ মসজিদে উপস্থিত হইল। রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ভাষণ দানে দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন– হে লোকসকল! তোমাদের মধ্য হইতে আমার বিদায় গ্রহণ নিকটবর্তী হইয়া আসিয়াছে; অতপর তোমরা আমাকে এই স্থানে তোমাদের মধ্যে আর দেখিতে পাইবে না। আমি তোমাদের নিকট জরুরী কথা বলিব; আমার পক্ষ হইতে অন্য কেহ ঐ কথাটি পৌঁছাইলে তাহা যথেষ্ট হইবে না ভাবিয়া আমি নিজেই তোমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াছি।

তোমরা লক্ষ্য করিয়া শুন– কাহারও পৃষ্ঠে আমি কোন আঘাত করিয়া থাকিলে আমার পৃষ্ঠ উপস্থিত রহিয়াছে; সে যেন তাহার ক্ষতিপূরণ আদায় করিয়া নেয়। আমার মন্দ বলার দ্বারা কাহারও সম্মানের হানি হইয়া থাকিলে আমার সম্মান উপস্থিত রহিয়াছে; সে যেন প্রতিশোধ নিয়া নেয়।

কেহ যেন ভয় না করে যে, (ঐরূপ করিলে) তাহার প্রতি আল্লাহর রসূলের আক্রোশ থাকিয়া যাইবে।

স্মরণ রাখিও– কাহারও প্রতি আক্রোশ রাখা আমার স্বভাবে নাই। আমার সর্বাধিক ভালবাসা ঐ ব্যক্তির জন্য যে আমার নিকট হইতে তাহার হক আদায় করিয়া নিবে, যদি আমার উপর তাহার কোন দাবী থাকে, কিম্বা দাবী ছাড়িয়া মাফ করিয়া দিবে। আমি যেন মহান আল্লাহর সাক্ষাতে এমন পাক-সাফ অবস্থায় যাইতে পারি যে, আমার উপর কাহারও কোন দাবী না থাকে।

ফজল (রাঃ) বলেন– (নবীজীর ভালবাসাপ্রাপ্তির) এই ঘোষণা শুনিয়া এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিল, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার নিকট আমার তিনটি দেরহাম প্রাপ্য আছে। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিলেন, আমি কাহারও দাবী অস্বীকার করিব না বা দাবীদারকে কসম খাইতেও বলিব না। তবে তোমার প্রাপ্য কি সূত্রে? ঐ ব্যক্তি বলিল, হুজুরের স্মরণ আছে কি? একদা এক সাহায্যপ্রার্থী ব্যক্তিকে (হুজুরের পক্ষ হইতে) তিনটি দেরহাম দেওয়ার জন্য আমাকে বলিয়াছিলেন। নবী (সঃ) তখন বলিলেন, হে ফজল! তাহাকে তিনটি দেরহাম দিয়া দাও। নবী (সঃ) পুনঃ পুনঃ তাঁহার ঐ বক্তব্য বলিলেন। অতপর বলিলেন–

হে লোকসকল! সরকারী ধনভাণ্ডার হইতে কেহ কোন কিছু আত্মসাত করিয়া থাকিলে তাহা অবশ্যই ফেরত দিয়া দিবে। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিল, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার উপর তিনটি দেরহাম রহিয়াছে; এক জেহাদে যুদ্ধলব্ধ ধন বায়তুল মালের হক হইতে আমি তাহা নিয়াছিলাম। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিলেন, তুমি কেন তাহা নিয়াছিলে? ঐ ব্যক্তি বলিল, আমি প্রয়োজনে বাধ্য হইয়া নিয়াছিলাম। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিলেন, হে ফজল! তিনটি দেরহাম তাহার নিকট হইতে আদায় করিয়া লও। অতপর বলিলেন–

হে লোকসকল! কাহারও ঈমান ইসলামে আভ্যন্তরীণ কোন কপটতা অনুভব করিলে সে দাঁড়াও আমি তাহার জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করি। এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিল, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি মোনাফেক, মিথ্যাবাদী, কপট, হতভাগা। ওমর (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, ধিক্ তোমার প্রতি– আল্লাহ তাআলা তোমার দোষ গোপন রাখিয়াছিলেন; তুমি কেন তাহা প্রকাশ করিয়া নিজের বদনাম করিলে! রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিলেন, হে খাত্তাব পুত্র (ওমর)! চুপ থাক। দুনিয়ার বদনাম-লজ্জা অতিক্ষীণ ও সহজ আখেরাতের বদনাম ও লজ্জা হইতে। অতপর নবীজী (সঃ) ঐ ব্যক্তির জন্য দোয়া করিলেন, হে আল্লাহ! এই ব্যক্তি যখন নিজের শুদ্ধি চাহিয়াছে তখন তুমি তাহাকে শুদ্ধি দান কর, ঈমান দান কর, দুর্ভাগ্য হইতে মুক্তি দাও। তারপর রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিলেন, ওমর আমার সঙ্গী, আমি ওমরের সঙ্গী, সত্য সদা ওমরের সঙ্গে থাকিবে। (বোদায়া, ৪–২৩১)

কাহারও প্রতি কোন অন্যায় করিয়া থাকিলে সর্বোচ্চ ক্ষমতায় ক্ষমতাবান হইয়াও উহার প্রতিশোধ দানে নতশিরে প্রস্তুত হওয়ার আদর্শ নবীজী মোস্তফা (সঃ) স্থাপন করিয়া গেলেন। তাঁহার পরেও সুযোগ্য খলীফাগণ এই আদর্শের অনুসরণে অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন।

আম্‌র ইবনে শোআয়েব (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খলীফা ওমর (রাঃ) সিরিয়ায় আগমন করিলেন। এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট সিরিয়ার গভর্ণরের বিরুদ্ধে তাহাকে প্রহার করার অভিযোগ করিল এবং তাহার প্রতিশোধ চাহিল। ওমর (রাঃ) উক্ত গভর্নর হইতে প্রতিশোধ দানের ইচ্ছা করিলেন। (বিশিষ্ট ছাহাবী এবং মিসরের গভর্নর) আম্‌র ইবনুল আছ (রাঃ) ওমর (রাঃ)-কে বলিলেন, সিরিয়ার গভর্ণর হইতে এক ব্যক্তির প্রতিশোধ গ্রহণ করা হইবে? ওমর (রাঃ) বলিলেন, নিশ্চয়। মিসরের গভর্নর বলিলেন, এরূপ হইলে ত আমরা আপনার চাকুরী করিব না। ওমর (রাঃ) বলিলেন, না কর; তাহাতে আমার কোন পরোয়া নাই– এই ভয়ে আমি প্রতিশোধ দানের নীতি ছাড়িতে পারি না; যেহেতু আমি দেখিয়াছি, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম স্বেচ্ছায় প্রতিশোধ দানে আগাইয়া আসিয়াছেন। মিসরের গভর্নর বলিলেন, এই ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করিয়া দিলে চলিবে কি? ওমর (রাঃ) বলিলেন, তাহা করিতে পার।

সায়ীদ ইবনে মোসাইয়্যেব (রঃ) বলিয়াছেন, নবী (সঃ) স্বেচ্ছায় প্রতিশোধ দান করিয়াছেন, আবু বকর (রাঃ) এবং ওমর (রাঃ)ও স্বেচ্ছায় প্রতিশোধন দান করিয়াছেন।

(তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ১–৩৭৪)

করুণা বিজড়িত কণ্ঠের আর একটি ভাষণ

আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক মাসকাল পূর্বে আমরা নবীজীর ইহধাম ত্যাগের আভাস পাইয়াছিলাম। অন্তিম সময় যখন একেবারেই ঘনাইয়া আসিল এবং বিদায় মুহূর্ত নিকটবর্তী হইয়া আসিল তখন একদা রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁহার শেষ শয্যাকক্ষ আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার গৃহে আমাদিগকে সমবেত করিলেন। অতপর সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন–

আল্লাহ তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষণ করুন, তোমাদিগকে আশীর্বাদ করুন, তোমাদের ক্ষতিপূরণ দান এবং ব্যথা বেদনা দূর করুন, তোমাদিগকে নেয়ামত দান করুন, তোমাদিগকে সাহায্য করুন, তোমাদিগকে উন্নতি দান করুন এবং তাঁহার আশ্রয়ে তোমরা নিরাপদ থাক।

আমি তোমাদিগকে আল্লাহর নামে ধর্মভীরু হইবার অসিয়ত করিতেছি, তোমাদিগকে তাঁহার হাতে সমর্পণ করিয়া যাইতেছি। আমি তোমাদিগকে আল্লাহর আযাব হইতে সতর্ক করিয়া যাইতেছি। তাঁহার পক্ষ হইতে সুস্পষ্ট সতর্কবাণী শুনাইয়া যাইতেছি– সাবধান! আল্লাহর দুনিয়াতে আল্লাহর বান্দাদের উপর অহঙ্কার ও অন্যায় আচরণ করিও না। সদা স্মরণ রাখিবা, আল্লাহ আমার জন্য এবং তোমাদের জন্য পরিষ্কার বলিয়াছেন– تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا ـ

অর্থ ঃ "এই যে পরকালের শান্তির নিবাস– ইহা আমি সেই লোকদিগের জন্যই নির্ধারিত করিয়া থাকি যাহারা পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য অহঙ্কার দেখাইতে এবং বিপর্যয় ঘটাইতে চাহে না, সংযমশীল খোদাভীরু লোকগণই পরিণামে কল্যাণ লাভ করিবে।"

আল্লাহ তাআলা আরও বলিয়াছেন– اَلَيْسَ فِىْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِيْنَ ـ

অর্থ ঃ "অহঙ্কাকারীদের বাসস্থান অবশ্যই জাহান্নামে হইবে।"

আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার শেষ মুহূর্ত কবে? তিনি বলিলেন, বিদায় অতি নিকটবর্তী, যাত্রা আল্লাহর সন্নিধানে এবং চিরস্থায়ী বেহেশতের দিকে।

আমরা আরজ করিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনাকে গোসল কে দিবে? হুজুর (সঃ) বলিলেন, আমার আপনজনদের মধ্যে নিকটতম ব্যক্তি। কাফন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, আমার পরিধেয় কাপড়েই এবং ইচ্ছা করিলে তৎসঙ্গে মিসরীয় বা ইয়ামানী সাদা এক জোড়া কাপড়। জানাযার নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন,

গোসল দিয়া কাফন পরাইবার পর খাটের উপরে কবরের কিনারায় রাখিয়া কিছু সময় তোমরা অন্যত্র থাকিও। সর্বপ্রথম জানাযা পড়িবেন জিব্রাঈল, তারপর মীকাঈল, তারপর ইস্রাফীল, তারপর আযরাঈল– প্রত্যেকের সঙ্গেই ফেরেশতাগণের বিরাট দল থাকিবে। তারপর তোমরা জমাত জমাত আসিয়া দরূদ এবং সালাম পাঠ করিয়া যাইবে। আর একটি কথা–

তোমরা আমার অনুপস্থিত ছাহাবীদিগকে আমার "সালাম" পৌঁছাইয়া দিবে।

এতদ্ভিন্ন আজ হইতে কেয়ামত পর্যন্ত যাহারা আমার প্রচারিত ধর্মের অনুসরণ করিবে তাহাদের সকলের প্রতিও আমার "সালাম"। (যোরকানী, ৪–২৬৯)

পাঠক-পাঠিকা! আসুন!! আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সালামে কৃতার্থ হইয়া সমবেত কণ্ঠে সেই মহান সালামের উত্তর দানে বলিতে থাকি–

লক্ষ-কোটি দরূদ ও সালাম আপনার প্রতি– হে আল্লাহর রসূল।

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

লক্ষ-কোটি দরূদ ও সালাম আপনার প্রতি– হে আল্লাহর নবী।

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَ اللّٰهِ

লক্ষ-কোটি দরূদ ও সালাম আপনার প্রতি– হে আল্লাহর হাবীব।

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰهِ

বোখারী শরীফ বাংলা তরজমা দ্বিতীয় খণ্ড লেখাকালীন ১৩৭৭ হিজরী মোতাবেক ১৯৫৮ সনে হজ্জ উপলক্ষে পবিত্র মদীনায় হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের দরবারে পঠিত–

الالتجاء والحنين مع الصلوة والسلام الى سيد المرسلين

রসূলগণের সরদার সমীপে করুণা ভিক্ষা, আবদার এবং প্রাণের আবেগপূর্ণ দরূদ ও সালাম

بِنَفْسِيْ وَاَوْلَادِيْ وَاُمِّيْ وَوَالِدِيْ ـ عَلٰى تُرْبَةٍ طَابَتْ بِطِيْبِ مُحَمَّدٍ

আমার প্রাণ, আমার সন্তান-সন্ততি, আমার মাতা-পিতা সর্বস্ব ঐ পাক ভূখণ্ডের উপর উৎস যেই ভূখণ্ড হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সুগন্ধে সুগন্ধময় হইয়া আছে।

عَلٰى تُرْبَةٍ فَاقَتْ عَلَى الْعَرْشِ رُتْبَةً ـ وَحَازَتْ رِيَاضُ الْجَنَّةِ الْمُتَاَبِّدِ

আমার সর্বস্ব উৎসর্গ ঐ ভূখণ্ডের উপর, যাহার মর্যাদা আরশ অপেক্ষা অধিক এবং যেই এলাকায় অনন্তময় বেহেশতের বাগিচা বিরাজমান–

وَوَارَتْ حَبِيْبًا رَبُّنَا قَدْ اَحَبَّهٗ ـ فَلَمْ يُبْقِ فِيْنَا بِالْبَقَاءِ الْمُخَلَّدِ ـ

যেই বিশেষ ভূখণ্ডটি আল্লাহ তাআলার প্রিয়তম দোস্তকে ঢাকিয়া আছে। তিনি আল্লাহর অতি প্রিয়; তাই তাঁহাকে আমাদের মধ্যে দীর্ঘকাল না রাখিয়া ডাকিয়া নিয়াছেন।

لَاَذْكُرُ اَيَّامَ الْحَبِيْبِ بِطَيْبَةٍ ـ فَاَصْعَقُ مَغْشِيًّا عَدِيْمَ التَّجَلُّدِ ـ

প্রিয়পাত্র (হযরত নবী সঃ) যখন এই "তায়বা" মদীনায় অবস্থানরত ছিলেন তখনকার মধুর দৃশ্যের কল্পনা, ধ্যান ও স্মরণ করতঃ আমি ধৈর্যহীন হুশহারা হইয়া পড়ি।

اَمُرُّ بِاٰثَارِ الْحَبِيْبِ بِطَيْبَةٍ ـ فَكَادَ فُؤَادِيْ اَنْ يَّطِيْرَ بِمَوْجِدٍ

আমি যখন তায়বাস্থিত প্রিয়তমের নিদর্শনসমূহের নিকট যাতায়াত করি তখন মনে হয়– ঐ সবের আকর্ষণে আমার প্রাণপাখী উড়িয়া যাইবে।

فَهٰذِيْ بِقَاعٌ وَّالْجِبَالُ وَمَعْهَدٌ ـ وَبِيْرٌ وَّبُسْتَانٌ وَّاٰثَارُ مَشْهَدٍ

এই বিশেষ বিশেষ স্থানসমূহ, পাহাড়সমূহ, রাস্তা-ঘাট ও বিভিন্ন কূপ, বাগ-বাগিচার স্থান এবং তাঁহার উপস্থিতির স্থানের নিদর্শনসমূহ এবং

وَدُوْرٌ وَّاُطَامٌ وَّمِمْبَرُ خُطْبَةٍ ـ اَسَاطِيْنُ اَعْلَامٌ وَمِحْرَابُ مَسْجِدٍ ـ

বিভিন্ন ঘর-বাড়ী, টিলা, খোতবা দানের মিম্বর এবং মসজিদস্থিত কতিপয় খুঁটি ও মেহরাব–

لَتَمْلَأُمِنْ ذِكْرَى الْحَبِيْبِ قُلُوْبَنَا ـ وَتُوْرِثُ نَارًا فِىْ طُلُوْعٍ وَاَكْبُدِ

উল্লিখিত নিদর্শনসমূহ আমার প্রাণকে প্রিয় পাত্রের স্মরণে পরিপূর্ণ করিয়া দেয় এবং আমার হৃদয়পটে প্রজ্বলিত অগ্নির সঞ্চার করে।

كَاَنَّ فُؤَادِىْ اِذْ اَتَيْتُ بِبَابِهٖ ـ لَجَمْرَةُ نِيْرَانٍ شَدِيْدُ التَّوَقُّدِ ـ

আমি তাহার দ্বারে পৌঁছার মুহূর্তে আমার হৃদয় যেন একটি প্রজ্বলিত অগ্নিখণ্ড।

وَلَمْ اَسْتَفِقْ حَتّٰى اَقُوْلَ مَقَالَةً ـ وَاُدْرِكَ اِدْرَاكًا بِقَلْبِىَ الْمُقَدَّدِ

তদবস্থায় আমার হুশ-জ্ঞান বিদ্যমান ছিল না যে, আমি কিছু বলিতে পারি এবং আমার বিদীর্ণ হৃদয়ে কিছু অনুভব করিতে সক্ষম হই।

فَاَرْسَلْتُ دَمْعِىْ لِلْفُؤَادِ مُتَرْجِمًا ـ فَيَا عَيْنُ جُوْدِىْ وَاَهْمِلِىْ لَاتَجَمَّدِىْ

অগত্যা অন্তরের আবেগ প্রকাশে অশ্রু-বৃষ্টি বহাইলাম; হে নয়ন! খুব অশ্রু বহাও, থামিও না।

وَيَاعَيْنُ جُوْدِىْ وَاَهْمِلِىْ مِنْ مَّدَامِعٍ ـ وَصُبِّىْ عُيُوْنًا مِّنْ دِمَاءٍ لِتَسْعَدِىْ

হে নয়ন! অবিরাম অশ্রুপাত কর; রক্তশ্রোতের নদী বহাইয়া দাও, ইহাই তোমাদের সৌভাগ্য।

وَيَا عَيْنُ سُحِّىْ وَاسْكُبِىْ كُلَّ قَطْرَةٍ ـ نَجِيْعًا وَدَمْعًا كَىْ تَفُوْزَ بِمَقْصَدِ

হে নয়ন! অশ্রু ও রক্তের প্রতিটি বিন্দু বহাইয়া দাও, ইহাতে তোমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার সাফল্য

وَيَا نَفْسُ ذُوْبِىْ ثُمَّ سِيْلِىْ مَدَامِعًا ـ عَلٰى رَسْمِهٖ رَسْمِ الدِّيَارِ وَمَلْحَدِ

হে প্রাণ! প্রিয়-পাত্রের ঘর-বাড়ী ও সমাধি-চরণে উৎসর্গ হওয়ার সুযোগ হারাইও না– বিগলিত হইয়া অশ্রু আকারে বহিয়া যাও।

لِاَىِّ مَرَامٍ تُرْصِدُ الْعَيْنُ مَائَهَا ـ وَاَىُّ مَرَامٍ يُرْصَدُ النَّفْسُ لِلْغَدِ

আর কোন্ আকাঙ্ক্ষা পূরণের মানসে চক্ষু স্বীয় অশ্রু রক্ষিত রাখিবে? আর কোন্ আকাঙ্ক্ষায় আমার প্রাণ আগামী দিনের জন্য বাঁচিয়া থাকিবে?

عَلَيْكَ سَلَامٌ يَامُطَيِّبُ طَيْبَةٍ ـ لَاَنْتَ مَلَاذِىْ اِذْ اَتٰى يَوْمُ مَوْعِدِ ـ

"তায়বা"কে মনোমুগ্ধকারী– হে মহান! আপনাকে সালাম। কেয়ামতের দিন আপনি আমার আশ্রয়স্থল।

وَاَنْتَ رَجَائِىْ فِىْ مَنَازِلِ مَحْشَرٍ ـ صِرَاطٍ وَّمِيْزَانٍ وَفِىْ كُلِّ مَوْرِدِ ـ

আপনি আমার আশার স্থল হাশরের ময়দানের প্রতিটি স্থানে– পোলসিরাত, নেকী-বদীর পাল্লার নিকট এবং অন্যান্য প্রতিটি ঘাঁটিতে।

مِنَ اللّٰهِ سَلْ تُعْطَهْ وَمِنْكَ شَفَاعَةُ ـ فَهٰذَا رَجَائِىْ يَاغِيَاثِىْ وَمَسْنَدِىْ

আপনার পক্ষ হইতে শাফাআতের প্রতিশ্রুতি এবং আল্লাহর পক্ষ হইতে আপনার শাফাআত পূরণের ঘোষণা– ইহাই আমার একমাত্র আশা-ভরসার স্থল।

بِذَنْبِيْ وَعِصْيَانِيْ لَغَى كُلُّ حِيْلَتِيْ ـ بِجُوْدِكَ يَاخَيْرَ الْجَوَادِ تَغَمَّدِ

গোনাহ ও নাফরমানীর দরুন আমার সমস্ত চেষ্টা-তদবীরই নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িয়াছে; হে দয়াল! আপনি স্বীয় দান সমুদ্রে আমাকে নিমজ্জিত করুন।

غَرِقْتُ بِبَحْرِ الذَّنْبِ مَالِيْ عِصْمَةٌ ـ فَخُذْ بِيَدِيْ اَنْتَ الْكَرِيْمُ فَخُذْ يَدِيْ

গোনাহের সমুদ্রে আমি নিমজ্জিত নিরুপায়, আপনি দয়ালু; আপনি আমার হাঁত ধরুন! আপনি আমার হাত ধরুন!

اَتَيْتُكَ مَسْلُوْبًا وَجِئْتُكَ هَارِبًا ـ اَغِثْنِيْ بِلُطْفٍ يَا مَغِيْثِيْ وَزَوِّدِ

আমি সর্বহারা হইয়া ঘর-বাড়ী ত্যাগ করতঃ আপনার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি। আপনি দয়া দরিয়া আমাকে সাহায্য করুন এবং আমার সম্বল করিয়া দিন।

اَتَيْتُكَ مَذْعُوْرًا مِنَ الذَّنْبِ خَائِفًا ـ اَتَيْتُكَ عَبْدًا مُسْتَجِيْرًا بِسَيِّدِ

আমি গোনাহের ভয়ে আতঙ্কিত হইয়া আপনার প্রতি ছুটিয়া আসিয়াছি, যেরূপ বিপদগ্রস্ত গোলাম মনিবের সাহায্যের প্রতি ছুটিয়া আসে।

اَتَيْتُ كَئِيْبًا مِّنْ دِيَارٍ بَعِيْدَةٍ ـ حَزِيْنًا بِاٰثَامٍ وَّوَجْهٍ مُسَوَّدِ

গোনাহের চিন্তামগ্ন কাল মুখ লইয়া দূরদেশ হইতে ক্লান্তাবস্থায় আপনার দ্বারে পৌঁছিয়াছি।

اَتَيْتُ بِقَلْبٍ مُّسْتَهَامٍ وَّمُغْرَمٍ ـ جَرِيْحٍ بِاٰسَافِ الْفِرَاقِ الْمُبَعَّدِ

পাগল-প্রাণ হইয়া উপস্থিত হইয়াছি; বিচ্ছেদ যাতনায় সেই প্রাণ বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

اَتَيْتُ بِشَوْقٍ وَاشْتِيَاقٍ وَرَغْبَةٍ ـ رَجَائِيْ بِكُمْ اَعْلٰى وَغَيْرُ مُعَدَّدِ

বহু আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আবদার নিয়া আসিয়াছি। আমার আকাঙ্ক্ষা অসংখ্য ও অতি বড়।

اَتَيْتُكَ مَوْلَائِيْ بِلُطْفِكَ رَاجِيًا ـ وَلَنْ يُّحْرَمَ الرَّاجِيْ بِبَابِ مُحَمَّدِ

আপনার দয়ার ভিখারী হইয়া আপনার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি, মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর দ্বার হইতে কোন ভিখারী কখনও বঞ্চিত হয় না।

لَاَغْضَبْتُ رَبِّيْ بِالْمَعَاصِيْ وَلَمْ اَجِدْ ـ وَسِيْلَةَ غُفْرَانِيْ سَوٰى بَابِ اَحْمَدِ

আমি আমার প্রভুর নাফরমানী করিয়া তাঁহাকে ক্রোধান্বিত করিয়াছি; এখন মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের দ্বার ভিন্ন আমার গোনাহ মাফ হওয়ার কোন উসিলা নাই।

هُوَ الْبَابُ بَابُ الْجُوْدِ وَالْكَرَمِ وَالسَّخَا ـ وَمَنْ يَّاْتِهِ يَاْتِ الْمَرَامَ وَيَسْعَدِ

এই দ্বার দান ও দয়া সাখাওয়াতের দ্বার, যেব্যক্তি এই দ্বারে উপস্থিত হয় সে মনোবাঞ্ছা পূরণে এবং সাফল্য লাভে সক্ষম হয়।

فَكَمْ مِنْ غَرِيْقٍ هَالِكٍ لُجَّ بَابَهٗ ـ نَجٰى نَائِلاً نُوْرًا مِنَ اللّٰهِ يَهْتَدِيْ

বহু নিমজ্জমান ধ্বংসের সম্মুখীন ব্যক্তি এই দ্বার আঁকড়াইয়া ধরিয়া আল্লাহ তাআলার হেদাআত ও নূর প্রাপ্তিতে পরিত্রাণ পাইয়াছে।

رَجَائِىْ اِلَيْكُمْ يَا شَفِيْعَ الْمُشَفَّعُ ـ وَمَنْ ذَا الَّذِىْ نَرْجُوْ اِلَيْهِ وَنَهْتَدِىْ

আপনি এমন সুপারিশকারী যে, আপনার সুপারিশ কবুল করিবেন বলিয়া আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা দিয়াছেন; তাই আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়া আপনার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি, আপনি ব্যতীত আর কে আছে যাহার প্রতি আমরা আশা করিতে পারি এবং ধাবিত হইতে পারি?

رَثٰى لِىْ عَدُوِّىْ مِنْ ذُنُوْبِىْ وَمَاثِمِىْ ـ فَمَا لِىْ لاَ اَرْجُوْ رَثَائِكَ سَيِّدِىْ

আমার গোনাহদৃষ্টে শত্রুর অন্তরেও দয়ার সঞ্চার হয়। আপনি আমার মনিব, আপনার অন্তরে দয়ার সঞ্চার হইবে বলিয়া আমি আশাবাদী কেন হইব না।

وَمَالِىْ عِنْدَ اللّٰهِ دُوْنَكَ حِيْلَةٌ ـ نَجَاةٌ وَّغُفْرَانٌ فَكُنْ اَنْتَ رَائِدِىْ

আল্লাহ তাআলার নিকট ক্ষমা ও পরিত্রাণ পাইবার জন্য আপনি ভিন্ন আমার আর কোন সূত্র নাই, তাই আপনি আমার সংস্থাপক হইয়া যান।

تَرَحَّمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ جِئْتُكَ رَاجِيًا ـ لاَنْتَ كَرِيْمٌ لِلْعَدُوِّ وَمُعْتَدِىْ

হে আল্লাহর রসূল! আমার প্রতি করুণার দৃষ্টি করুন, আমি আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়া আপনার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি– আপনি ত শত্রুর প্রতিও দয়াশীল।

وَاَنْتَ جَوَادٌ مَالِجُوْدِكَ سَاحِلٌ ـ فَمَا لِىْ لاَ اَرْجُوْ بِاَنَّكَ مُسْعِدِىْ

আপনার দয়ার সাগরের কূল-কিনারা নাই; তবে কেন আমি আশাবাদী হইব না যে, আপনি আমাকে সৌভাগ্যশীল করিবেন।

تَرَحَّمْ عَزِيْزَ الْحَقِّ يَا مَنْ بِلُطْفِهٖ ـ كَثِيْرٌ مِّنَ الْعَاصِىْ لِفِرْدَوْسِ يَهْتَدِىْ

আপনি নরাধম আজিজুল হকের প্রতি দয়ার দৃষ্টি করুন, আপনার উসিলায় বহু গোনাহগার ফেরদাউস বেহেশত লাভ করিয়া বসিবে।

فَرَبُّكَ يُعْطِىْ مَا تُرِيْدُ وَتَشْتَهِىْ ـ مُحِبُّ لِمَحْبُوْبٍ يُّطِيْعُ وَيَقْتَدِىْ

আপনি যাহাই ইচ্ছা ও পছন্দ করেন, আল্লাহ তাআলা তাহাই দান করিয়া থাকেন। দোস্ত দোস্তের মন রক্ষা করিয়া চলে।

عَلَيْكَ صَلٰوةٌ وَّالسَّلاَمُ وَرَحْمَةٌ ـ دَوَامًا مِّنَ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ مَيْعَدِ

আপনার প্রতি দরূদ ও সালাম এবং কেয়ামত পর্যন্ত আপনার উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হউক।

عَلَيْكَ صَلٰوةٌ وَّالسَّلاَمُ وَرَحْمَةٌ ـ اُلُوْفٌ وَّاٰلاَفٌ وَّمَا زَادَ فَازْدَدِ

আপনার প্রতি হাজার হাজার দরূদ, সালাম ও রহমত এবং আরও যতদূর অধিক হইতে পারে।

مُنًى كُنَّ فِىْ قَلْبِىْ غَرَسْتُ بِطَيْبَةً ـ فَاَسْقِىْ بِدَمْعٍ وَّالدِّمَاءِ لِتَجْتَدِىْ

আমার অন্তরের বহু আশা-আকাঙ্ক্ষা পবিত্র মদীনার ভূমিতে রোপণ করিলাম, এখন নয়নের অশ্রু ও রক্তের দ্বারা তাহাতে সেচন করিতে থাকিব। তবেই তাহাতে ফল ধরা সম্ভব হইবে।

فَمَا الْعَيْشُ بَعْدَ الْبُعْدِ مِنْ اَرْضِ طَيْبَةٍ ـ يَلَذُّ بِنَا وَالصَّبْرُ عَنْهَا بِمَبْعَدِ

মদীনা হইতে বিচ্ছিন্ন জীবনে আনন্দ থাকিতে পারে কি? মদীনাকে ভুলিয়া থাকা অসম্ভব।

وَهَلْ لَذَّةٌ لِّيْ فِي الدُّنْى وَنَعِيْمَهَا ـ اذَا اَنَا نَاءٍ مِّنْ مَّدِيْنَةِ سَيِّدِيْ

আমার মনিবের শহর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দুনিয়া এবং দুনিয়ার সামগ্রীসমূহ আমার নিকট স্বাদকর হইতে পারে কি?

حَيَاتِيْ عَلٰى بُعْدِ الْمَدِيْنَةِ مُرَّةٌ ـ وَقَلْبِيْ بِهٖ شَوْقٌ لِسَاحَةِ سَيِّدِيْ

মদীনা হইতে বিচ্ছেদে আমার জীবন বিষাক্ত এবং আমার মনিবের আঙ্গিনায় পড়িয়া থাকাই আমার অন্তরের একমাত্র আনন্দ।

تَمَنَّيْتُ مِن رَّبِّيْ جِوَارَ مَدِيْنَةِ ـ فَيَا لَيْتَ لِيْ فِيْهَا ذِرَاعٌ لِمَرْقَدِيْ

মদীনায় অবস্থান আল্লাহ তাআলার নিকট আমার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা; হায়! মদীনার মধ্যে কবরের জন্য এক হাত ভূমি আমার অদৃষ্টে জুটিবে কি?

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ شَهَادَةً فِيْ سَبِيْلِكَ وَالْمَوْتُ فِيْ بَلَدِ رَسُوْلِكَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارِكْ وَسَلَّمَ ـ

হে আল্লাহ! তোমার রাস্তায় শহীদ হওয়ার সুযোগ আমাকে দান কর এবং তোমার রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের শহরে আমার মৃত্যু নসীব কর। আমীন।

শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সময় ও তারিখ এবং হযরতের বয়স

ইহা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত যে, একাদশ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে সোমবার দিন হযরত (সঃ) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। ইহাও প্রায় অবধারিত যে, সোমবার দিন দুপুর বেলার পূর্বেই হঠাৎ অবস্থার ভয়ঙ্কর পরিবর্তন ঘটিয়া মৃত্যু যাতনা আরম্ভ হয় এবং দ্বিপ্রহরকাল পর্যন্ত শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

উক্ত সোমবার দিনটি রবিউল আউয়াল মাসের কোন্ তারিখ ছিল সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। প্রসিদ্ধ মত এই যে, তাহা ১২ই রবিউল আউয়াল ছিল, * কাহারও মতে ২ তারিখ, কাহারও মতে ১ তারিখ ছিল। (সীরাতে মোস্তফা, ৩-২০৫)

হযরত (সঃ) কত বয়সে ইহজগত ত্যাগ করিয়াছেন সে সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের মতভেদ আছে এবং এই সম্পর্কে রেওয়ায়েত বা বর্ণনাও বিভিন্ন রহিয়াছে। কিন্তু ৬৩ বৎসর সম্পর্কীয় বর্ণনাই বিশেষ অগ্রগণ্য।

১৭৪৬। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৬৪১) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তেষট্টি বৎসর বয়সে ইহজগত ত্যাগ করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা ঃ হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের (১) জন্ম। (২) নবুয়তপ্রাপ্তি (৩) মক্কা ত্যাগ

---

* ১২ই রবিউল আউয়াল দিনটি সোমবার হওয়ার জন্য ঐ মাসের প্রথম তারিখ বৃহস্পতিবার হওয়া আবশ্যক। কিন্তু ইহাতে একটি জটিল প্রশ্ন প্রতিবন্ধক হয়– তাহা এই যে, এই মাসের দুই মাস পূর্বে যিলহজ্জ মাসে হযরত (সঃ) বিদায় হজ্জ করিয়া আসিয়াছেন। ঐ মাসের নয় তারিখ তথা আরাফার দিন শুক্রবার ছিল ইহা অকাট্যরূপে অবধারিত। সেমতে যিলহজ্জ, মহররম, সফর এই তিনটি মাসের সবগুলিকে ৩০ দিনের বা ২৯ দিনের কিম্বা কোনটা ৩০ কোনটা ২৯ যে প্রকারেই হিসাব করা হউক, যিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখ শুক্রবার ধরিয়া কোন মতেই রবিউল আউয়াল মাসের প্রথম তারিখ বৃহস্পতি ও ১২ তারিখ সোমবার হইতে পারে না। এই জন্য হযরতের ওফাতের তারিখ সম্পর্কে ১২ই রবিউল আউয়াল, অনেকে অস্বীকার করিয়া বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু হযরতের ওফাতের দিন সোমবার এবং ১২ই রবিউল আউয়াল এই মতবাদটা সর্বত্র এতই প্রসিদ্ধ যে, উহা উড়ান যায় না। মাওলানা আবদুল হাই সাহেব মজমুয়া ফতওয়া ২-২৩৯ পৃ উক্ত প্রশ্নটির ভাল মীমাংসা দিয়াছেন যে-বোধ হয়, হযরতের বিদায় হজ্জের বৎসর যিলহজ্জ মাসের প্রথম তারিখ মক্কায় ও মদীনায় চাঁদ দেখার হিসাবে বিভিন্ন ছিল। পূর্ববর্তী

(৪) মৃত্যু– এই বিষয়গুলির সঠিক দিন-তারিখ নির্ধারণ যদিও পরবর্তী ঐতিহাসিকগণের রুচি দৃষ্টে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে, কিন্তু সেই যুগেও ঐসব বিষয় ঘটনার কোন সঠিক দিন-তারিখ নির্ধারণের গুরুত্ব মোটেই ছিল না। এতদ্ভিন্ন ইসলামেও উহার কোন গুরুত্ব মোটেই নাই। সুতরাং প্রতিটি বিষয়ের দিন-তারিখ সংরক্ষণ করা হয় নাই। পরবর্তীকালে কোন কোন ছাহাবী এ সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন, ফলে তাঁহাদের মন্তব্যের মধ্যে কিছুটা বিভিন্নতা সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে– যাহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। সেই বিভিন্নতা সূত্রেই মোটামুটি হিসাবের বেলায়, (১) ঠিক কত বয়সে নবুয়ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, (২) নবুয়ত প্রাপ্তির পর কত দিন মক্কায় অবস্থান করিয়াছেন, (৩) মদীনায় কত দিন অতিবাহিত করিয়াছেন (৪) সর্বমোট কত বৎসর বয়সে ইহজগত ত্যাগ করিয়াছিলেন– এইসব বিষয় নির্ধারণে মতামতের বিভিন্ন সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন এই ধরনের হিসাবাদির মধ্যে স্বাভাবিকরূপেই অনেক সময় বৎসরের ভাঙ্গা মাস, মাসের ভাঙ্গা দিনগুলির সঠিক তারিখ নির্ধারণ করা হয় না; যেরূপ দিনের ভাঙ্গা ঘণ্টা, ঘণ্টার ভাঙ্গা মিনিট এবং মিনিটের ভাঙ্গা সেকেণ্ডগুলির সূক্ষ্ম হিসাবের প্রতি কেহই দৃষ্টি দান করে না; বরং কেহ বা ঐ ভাঙ্গাগুলি পূর্ণ ধরিয়া হিসাব করে, কেহবা ঐ ভাঙ্গাগুলিকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়া হিসাব ধরে। দশকের মধ্যবর্তী ভাঙ্গা সংখ্যা সম্পর্কেও ঐরূপ করা হয়। এইভাবেও মোটামুটি সংখ্যা নির্ধারণে মতভেদ হইয়া থাকে।

হয়রত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বয়স সম্পর্কে মতভেদটাও সেই শ্রেণীরই। এ স্থলে তিন প্রকার মতামত বর্ণিত রহিয়াছে। ৬০, ৬৩ এবং ৬৫। প্রকৃত প্রস্তাবে হযরতের সঠিক বয়স ছিল ৬৩, কিন্তু কেহ কেহ দশক তথা ৬০-এর উপরে ভাঙ্গা ৩-এর সংখ্যা বাদ দিয়াছে,আবার কেহ জন্ম ও মৃত্যুর ভাঙ্গা বৎসর দুইটি পূর্ণ বৎসর হিসাব করিয়াছে, ফলে দুই বৎসর বর্ধিত হইয়া ৬৫-এর সংখ্যা হইয়াছে।

শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পর

হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মৃত্যুর খবর ছড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে সারা মদীনায় বিহ্বলতার অন্ধকার ছাইয়া গেল। ছাহাবীগণের মধ্যে সকলে এই কথা বিশ্বাস করিয়া নিতে পারিলেন না যে, হযরতের মৃত্যু হইয়াছে। হযরত (সঃ)-কে চির নিদ্রায় দেখা সত্ত্বেও তাঁহারা ভাবিলেন, ওহী নাযিল হওয়াকালে হযরতের উপর এইরূপ আচ্ছন্নতা পরিলক্ষিত হইত, এখনও সেই অবস্থায়ই হয়ত হযরত (সঃ)-কে দেখা যাইতেছে, কস্মিনকালেও তাঁহার মৃত্যু হয় নাই।

এইরূপ ধারণা পোষণকারীদের মধ্যে ওমর ফারুক (রাঃ) ছিলেন সর্বাগ্রে এবং সর্বাধিক অটল। এমনকি তিনি উন্মুক্ত তরবারি হাতে লইয়া বিহ্বলতার মধ্যে ঘোষণা দিতে লাগিলেন, যে কেহ বলিবে যে, মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মৃত্যু হইয়াছে, আমি তাহাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিব। হযরতের মৃত্যু হয় নাই, তিনি অচিরেই স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিবেন এবং মোনাফেকদের মূল উচ্ছেদ করিবেন। ওমর (রাঃ) তাঁহার উক্তির প্রচারে লোকদের মধ্যে বক্তৃতাও করিতেছিলেন। ওসমান (রাঃ), আলী (রাঃ) এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ছাহাবীগণ বিহ্বলতার মধ্যে কেহবা নির্বাক অচেতন অবস্থায় ছিলেন, কেহবা অশ্রু স্রোতে

যিলকদ মাসের প্রথম তারিখ– হযরতের হজ্জযাত্রার তারিখ বর্ণনাকারীদের হিসাব মতে বুধবার ছিল। এই মাসের ২৯ তারিখ বুধবার হযরত (সঃ) এবং তাঁহার সঙ্গীগণ মক্কার পথে থাকিয়া যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখেন; মক্কাতেও তাহাই হয়। সেমতে যিলহজ্জ মাসের প্রথম তারিখ হয় বৃহস্পতিবার এবং ৯ তারিখ হয় শুক্রবার। কিন্তু ঐদিন মদীনাতে যিলহজ্জের চাঁদ দৃষ্ট হয় নাই এবং সেই যুগে মক্কা এলাকার খবর মদীনা শহরে সময়মত পৌছিতে পারে নাই। মদীনা শহরে যিলকদের চাঁদ ৩০ দিনের গণ্য হইয়া যিলহজ্জের প্রথম তারিখ শুক্রবার হইয়াছে এবং মদীনায় এই হিসাবই প্রচলিত হইয়া গিয়াছে; পরেও এই বিষয়ে কোন তৎপরতার প্রয়োজন হয় নাই। যিলহজ্জ মাসও ৩০ দিনের হইয়া প্রথম মহররম রবিবার হইয়াছে। মহররম মাসও ৩০ দিনের হইয়া প্রথম সফর মঙ্গলবার হইয়াছে। সফর মাসও ৩০ দিনে হইয়া প্রথম রবিউল-আউয়াল বৃহস্পতিবার হইয়াছে। এই হিসাব মক্কা এলাকার ৯ই যিলহজ্জ শুক্রবার এবং মদীনা এলাকার ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার সঙ্গতিপূর্ণই বটে। ৯ই যিলহজ্জ আরাফার দিন শুক্রবার মক্কা এলাকার হিসাব অনুযায়ী হইয়াছে। আর ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার মদীনা এলাকার হিসাবে হইয়াছে।

ভাসিতেছিলেন।

আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এই দিন ভোর বেলা হযরত (সঃ)-কে অপেক্ষাকৃত সুস্থ দেখিয়া মদীনার দূর প্রান্তে চলিয়া গিয়াছিলেন; তথায় তাঁহাকে এই প্রলয়ঙ্করী সংবাদ পৌঁছান হইল। বিহ্বলতার চরমে পৌঁছা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে ধীরস্থিরতার তওফীক দান করিলেন। সমগ্র জাতি সর্বহারারূপে বিশৃঙ্খলাময় প্রলয়ঙ্করী বিপদের মুখে পতিত অবস্থায় জাতির কর্ণধারকে যেরূপ হইতে হয়, আল্লাহ তাআলা আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-কে ঐ মুহূর্তে ঠিক সেই গুণে গুণান্বিত করিয়া সাজাইলেন। যাঁহার সাহচর্যে আবু বকর (রাঃ) সর্বস্ব বিলীন করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার বিচ্ছেদ যাতনার অগ্নি আবু বকরের অন্তরকে পুড়িয়া ভস্ম করিতেছিল, কিন্তু তাহার বহিরাকৃতি পর্বততুল্য অটল-অবিচল ছিল। আবু বকর (রাঃ) সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ায় চড়িয়া দ্রুত চলিয়া আসিলেন এবং কাহারও সঙ্গে কথাবার্তা না বলিয়া স্বীয় কন্যা আয়েশার কক্ষে প্রবেশ করিলেন; তথায় সর্দারে দোজাহান চাদরে আবৃত রহিয়াছেন, "ছাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি অসাল্লাম।"

১৭৪৭। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৬৪০) আবু সালামা (রাঃ) আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, (হযরতের মৃত্যু সংবাদে) আবু বকর (রাঃ) মদীনার দূর প্রান্তে "সুনহ্"স্থিত তাঁহার গৃহ হইতে ঘোড়ায় চড়িয়া দ্রুত আসিলেন এবং সোজা মসজিদে নববীতে প্রবেশ করিলেন। অতপর কাহারও সঙ্গে কথাবার্তা না বলিয়াই আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রতি অগ্রসর হইলেন; হযরত (সঃ) একটি চাদরে আবৃত ছিলেন।

আবু বকর (রাঃ) হযরতের চেহারা মোবারক হইতে চাদর হটাইয়া তাঁহার ললাটে চুম্বন করিলেন। আবু বকরের (রাঃ) নীরবে অশ্রুধারা বহিয়া পড়িল। অতপর হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আমার মাতা-পিতা আপনার চরণে উৎসর্গ, (আল্লাহর সাধারণ নিয়মাধীন) আপনার জন্য যে মৃত্যু নির্ধারিত ছিল সেই মৃত্যু আপনার উপর আসিয়া গিয়াছে (এখন পুনঃ আগমন হইলে দ্বিতীয়বারও মৃত্যু অনিবার্য) আল্লাহ তাআলা আপনার উপর মৃত্যুকে দুই সুযোগ দান করিবেন না।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, অতপর আবু বকর (রাঃ) কক্ষ হইতে বাহিরে আসিলেন। ওমর (রাঃ) লোকদের মধ্যে স্বীয় বক্তব্য (হযরতের মৃত্যু হয় নাই) প্রচার করিয়া বক্তৃতা দিতেছিলেন। আবু বকর (রাঃ) ওমরকে বসিয়া যাইতে বলিলেন। তিনি বসিলেন না (বিহ্বলতার মধ্যে স্বীয় বক্তব্য বলিয়া যাইতে লাগিলেন। তখন আবু বকর (রাঃ) দাঁড়াইয়া গেলেন)। ফলে লোকজন ওমরকে ছাড়িয়া আবু বকরের প্রতি ধাবিত হইল। আবু বকর (রাঃ) তেজোদৃপ্ত ভাষায় এক যুগান্তকারী ভূমিকা সকলের সামনে তুলিয়া ধরিলেন। তিনি বলিলেন–

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَاِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللّٰهَ فَاِنَّ اللّٰهَ حَيٌّ لَايَمُوْتُ ـ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى " وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَاِنْ مَاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا ـ وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ "ـ

অর্থ ঃ "তোমাদের মধ্য হইতে কেহ যদি মুহাম্মদের পূজারী হইয়া থাক তবে সে জানিয়া লও যে, তাহার মৃত্যু হইয়া গিয়াছে (যদ্দারা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে, মুহাম্মদ যত বড়ই হন না কেন, কিন্তু তিনি মা'বুদ হইতে পারেন না।) আর যাহারা আল্লাহর বন্দেগীকারী তাহারা জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ হইলেন আনাদি-অনন্ত, চীর জীবন্ত– তাঁহার মৃত্যু আসিতেই পারে না (সুতরাং আল্লাহর দ্বীন ও তাঁহার এবাদত চির বিদ্যমান থাকিবে।) সঙ্গে সঙ্গে আবু বকর (রাঃ) পবিত্র কোরআনের একটি আয়াতও তেলাওয়াত করিলেন। যাহার অর্থ এই–

"মুহাম্মদ রসূল বটে (কিন্তু মানুষ তিনি খোদা নহেন) তাঁহার পূর্বে আরও অনেক রসূল আসিয়াছিলেন, যাঁহাদের কেহই দুনিয়াতে চিরজীবী হন নাই, সকলেরই মৃত্যুই হইয়াছে; (মুহাম্মদ (সঃ)ও সেই একই পথের পথিক)। সুতরাং মুহাম্মদ (সঃ) মরিয়া গেলে বা শহীদ হইয়া গেলে তোমরা কি (দ্বীন-ইসলাম ছাড়িয়া) পিছনের অধঃপতনের অবস্থার দিকে ফিরিয়া যাইবে? যে কেহ পিছনের দিকে, অধঃপতনের দিকে ফিরিয়া যাইবে (সে নিজেরই ক্ষতি করিবে; আল্লাহর কোন ক্ষতিই সে করিবে না। আর জানিয়া রাখিও,) যাহারা সর্বাবস্থায় আল্লাহর নেয়ামতের কদর করিয়া চলিবে, আল্লাহ তাহাদিগকে উত্তম প্রতিফল দান করিবেন।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, খোদার কসম! লোকগণ যেন ইতিপূর্বে জানিতই না যে, এই আয়াত পবিত্র কোরআনে রহিয়াছে; আবু বকর তেলাওয়াত করার পরেই যেন তাহারা জানিতে পারিল এবং সকলেই আবু বকরের মুখ হইতে তাহা গ্রহণ করিয়া নিল, এমনকি কোন একজন মানুষও আমি দেখি নাই, যে তখন এই আয়াত তলাওয়াত করিতেছিল না।

ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন যে, আবু বকরের মুখে এই আয়াত শুনার সঙ্গে সঙ্গে আমার হাত-পা ভাঙ্গিয়া পড়িল। যখন আমি উক্ত আয়াতের তেলাওয়াত আবু বকরের মুখে শুনিলাম এবং উপলব্ধি করিতে পারিলাম যে, নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মৃত্যু হইয়া গিয়াছে, তখন আর আমি আমার পায়ের উপর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলাম না, মূর্ছা খাইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলাম।

ভূপৃষ্ঠ হইতে হযরতের দেহ মোবারকের বিদায় গ্রহণ

সোমবার দিন দ্বিপ্রহর পর্যন্ত হযরত (সঃ) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ঐ দিনের অবশিষ্ট দীর্ঘ সময় ত শোক-বিহ্বলতার মধ্যে কাটিল; তাহা হইতে অবসর লাভের পূর্বেই সকলে অন্য আর একটি সমস্যায় জড়াইয়া পড়িলেন। সেইটি হইল শাসনযন্ত্র পরিচালনার ক্ষেত্রে হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের স্থলাভিষিক্তের মনোনয়ন। বিষয়টি ছিল অত্যাবশ্যকীয়, বিশেষতঃ ঐ মুহূর্তে। কারণ চতুর্দিকে দ্বীন-ইসলামের শত্রুর অভাব ছিল না। মুসলিম জাতি বত্রিশ দাঁতের পরিবেষ্টনে এক জিহ্বার ন্যায় ছিল। তদুপরি মোনাফেকের দল আভ্যন্তরীণ শত্রুরূপে সর্বদাই সুযোগের সন্ধানে রহিয়াছে; এমতাবস্থায় উক্ত সমস্যার সমাধানের আবশ্যকতা কে অস্বীকার করিতে পারে? বিশেষতঃ যখন সকলের জানা ছিল যে, কাফন-দাফনে বিলম্ব হইলেও হযরতের দেহ মোবারকে কোন রকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নাই। সাধারণ শহীদের দেহই যখন কোন প্রকার বিকৃত হয় না, যাহার প্রামাণিক বিবরণ প্রথম খণ্ডে ৭০০ নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। এ স্থলে ত সাইয়্যেদুল মোরসালীনের দেহ বিকৃত হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না। এ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকায় সকলেই উক্ত সমস্যার সমাধানের প্রতি অধিক ব্যতিব্যস্ত হইলেন।

সাধারণ আলোচনার মধ্যেই আবু বকর (রাঃ) খলীফা নিযুক্ত হওয়ার পর মঙ্গলবার দিন হযরতের গোসল দানের সময় গায়েব হইতে আওয়াজ আসিল, আল্লাহর রসূলের দেহ পোশাক শূন্য করিও না, তিনি যেই পোশাকে রহিয়াছেন তাহাতে রাখিয়াই তাঁহাকে গোসল দান কর। তাহাই করা হইল এবং কাফন পরাইবার সময় উক্ত পেশাক খুলিয়া লওয়া হইল। (সীরাতে মোস্তফা, ৩-২১৯)

অতপর দাফন করার স্থান সম্পর্কে বিতর্ক হইলে আবু বকর (রাঃ) হাদীছ শুনাইলেন যে, পয়গম্বর (সঃ)-কে তাঁহার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের স্থলে দাফন করা হইবে। ইহাই চূড়ান্তরূপে গৃহীত হইল এবং ঐ স্থানেই কবর শরীফ খনন করা হইল।

মঙ্গলবার দিন কাফন পরাইয়া হযরতের দেহ মোবারক কবরের কিনারায় রাখিয়া দেওয়া হইল। সাধারণ

নিয়মে জামাতের সহিত পূর্ণাঙ্গ কায়দায় জানাযার নামায পড়া হইল না, * যেরূপ (অনেক ইমামগণের মজহাব অনুসারে) শহীদের জন্য জানাযার নামাযের আবশ্যক হয় না। অবশ্য দলে দলে সকলেই সন্নিকটে দাঁড়াইয়া তকবীর এবং দরূদ ও সালাম পাঠ করিয়া যাইতে লাগিল। প্রথমে ফেরেশতাগণ, অতপর প্রথম দলে আবু বকর, ওমর (রাঃ), তারপর নর-নারী আবাল-বৃদ্ধ সকল ছাহাবী দলে দলে আসিলেন।

কাহারও মতে, দরূদ-সালামের সেলসিলা তিন দিন পর্যন্ত চলিয়াছে, অর্থাৎ সোম, মঙ্গল, বুধ– এই তিন দিন দেহ মোবারক মাটির উপরেই ছিল, সেমতে বুধবার দিন শেষে বৃহস্পতিবার রাত্রে সমাহিত হইয়াছেন। অধিকাংশ মোসাদ্দেসগণের মতে মঙ্গলবার দিন শেষে বুধবারের রাত্রে সমাহিত হইয়াছিলেন।

(বেদায়া, ৫–২৭১)

عَطِّرِ اللّٰهُمَّ قَبْرَهُ الْكَرِيْمَ - بِعَرْفٍ شَذِيٍّ مِّنْ صَلٰوةٍ وَّتَسْلِيْمٍ -

হযরতের পরিত্যক্ত সম্পদ

হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) অন্যান্য মোহাজেরগণের ন্যায় নিঃস্ব অবস্থায়ই মদীনায় আসিয়াছিলেন। প্রথম দিকে মুসলমানগণ নিজ নিজ বাগানের এক দুইটি করিয়া খেজুর গাছ হযরত (সঃ)-কে দিয়া রাখিয়াছিলেন– হযরতের জীবিকা নির্বাহের উসিলা তাহাই ছিল। নিম্নে বর্ণিত হাদীছে তাহারই উল্লেখ রহিয়াছে।

১৭৪৮। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৪৪১) আনাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মদীনাবাসী কোন কোন মুসলমান নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে কতিপয় খেজুর বৃক্ষ দিয়া রাখিত, (তাহা দ্বারা হযরতের জীবিকা নির্বাহ হইত! মদীনার খেজুর বাগান-বিশিষ্ট শহরতলী এলাকা–) বনু কোরায়যা ও বনু নযীর ইহুদী গোত্রদ্বয়ের বস্তি মুসলমানদের করায়ত্ত হইলে পর তাহা হইতে প্রাপ্ত অংশবিশেষ দ্বারা হযরতের ব্যয় বহনের ব্যবস্থা হইল এবং হযরত (সঃ) লোকদের প্রদত্ত খেজুর বৃক্ষ ফেরত দিতে লাগিলেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ দুনিয়ার কোন আকর্ষণ যে হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে স্পর্শও করিতে পারিয়াছিল না তাহা নূতনভাবে বলিবার প্রয়োজন নাই। "যুদ" বা দুনিয়ার প্রতি বৈরীভাব সম্পর্কীয় অধ্যায়ের অসংখ্য হাদীছ এই বিষয়ে বিদ্যমান রহিয়াছে; যাহার কিছু বিবরণ ইনশা আল্লাহ তাআলা পরবর্তী খণ্ডে অনূদিত হইবে। ঐ সব হাদীছ এবং বিশেষরূপে ইতিহাসেই এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। সুতরাং বিশেষ কোন ধন-সম্পদ রসূলুল্লাহ (সঃ) পরিত্যক্তরূপে ছাড়িয়া যান নাই– ইহারই উল্লেখ নিম্নে বর্ণিত হাদীছে আছে।

১৭৪৯। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৬৪১) আম্‌র ইবনুল হারেস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম স্বর্ণ-রৌপ্যের কোন মুদ্রা কিম্বা ক্রীত দাস-দাসী (ইত্যাদি কোন ধন-সম্পদ দুনিয়াতে) রাখিয়া যান নাই। তাঁহার ব্যবহারের একটি শ্বেত বর্ণের খচ্চর এবং নিজস্ব যুদ্ধাস্ত্র রাখিয়া গিয়াছিলেন। আর রাখিয়া গিয়াছিলেন (পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণের) কিছু পরিমাণ বাগান জমি; তাহারও মূল ভূমি আল্লাহর ওয়াস্তে দান করিয়া গিয়াছিলেন।

১৭৫০। হাদীছ ঃ (পৃঃ ১৯৬) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ইহজগত ত্যাগের পর তাঁহার স্ত্রীগণ নিজেদের মীরাস লাভ করার জন্য ওসমান (রাঃ)-কে খলীফাতুল মুসলেমীন আবু বকরের নিকট পাঠাইতে উদ্যত হইলেন। তখন আয়েশা (রাঃ) তাঁহাদিগকে বলিলেন, আপনাদের কি স্মরণ নাই যে, হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন– لا نورث ما تركنا صدقة আমাদের (নবীগণের সম্পত্তির) ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারী কেহ হইতে পারে না; আমরা যাহা কিছু রাখিয়া যাইব সবই

* কারণ নবীগণের মৃত্যু প্রকৃত প্রস্তাবে মৃত্যু নহে, তাঁহাদের জীবন-সূর্য অস্তমিত হয় না, বরং শুধু আবরণে ঢাকিয়া যায় মাত্র। এই সূত্রেই তাঁহাদের মৃত্যুর পরেও অন্যত্র তাঁহাদের স্ত্রীগণের আর বিবাহ হইতে পারে না। সাধারণ শহীদের বেলায় এই হুকুম নাই।

সদকা পরিগণিত হইবে।

১৭৫১। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৯৯৬) আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার উত্তরাধিকারীগণ বণ্টন করিয়া নেওয়ার কোন টাকা-পয়সা পাইবে না। যাহা কিছু আমার পরিত্যক্ত থাকিবে উহা হইতে আমার স্ত্রীগণের ভরণ-পোষণ এবং কার্য পরিচালনাকারীগণের ব্যয় বহন করা হইবে; অতিরিক্ত যাহা থাকিবে তাহা দান বা সদকা পরিগণিত হইবে।

১৭৫২। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫২৬) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ফাতেমা (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পরিত্যক্ত মদীনাস্থ সম্পত্তি– যাহা দানস্বরূপ ছিল এবং ফদক এলাকা ও খায়বরের অংশ– এই সব সম্পত্তি হইতে স্বীয় উত্তরাধিকার স্বত্ব চাহিয়া আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নিকট সংবাদ পাঠাইলেন।

আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, আমাদের তথা নবীগণের সম্পত্তির কোন ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারী হইতে পারে না; তাহা সদকা পরিগণিত হইবে। অবশ্য মুহাম্মদের (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) পরিবারবর্গ ঐ সম্পত্তি হইতে, যাহা বস্তুতঃ আল্লাহর জন্য হইয়া গিয়াছে– ভরণ-পোষণ লাভ করিবে, তদতিরিক্ত ঐ সম্পত্তির মধ্যে সেই পরিবারবর্গেরও কোন হক বা অধিকার নাই।

আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের (এই সুস্পষ্ট নির্দেশের বিপরীত তাঁহার) দানকৃত বস্তুসমূহের মধ্যে আমি এক তিল পরিমাণও ব্যতিক্রম করিতে পারিব না। রসূলুল্লাহ (সঃ) স্বয়ং যেরূপে ঐ সবের পরিচালনা করিতেন আমিও ঠিক সেইরূপেই পরিচলনা করিব।

অতপর আলী (রাঃ) এক সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় আবু বকরের মর্তবা ও মর্যাদার স্বীকৃতি দানপূর্বক তাঁহাকে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আত্মীয়বর্গ এবং তাঁহাদের অধিকারের প্রতি লক্ষ্য করার আবেদন জানাইলেন।

তদুত্তরে আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমি ঐ সর্বশক্তিমান আল্লাহর কসম করিয়া বলিতেছি, যাঁহার ক্ষমতায় আমার জান-প্রাণ, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আত্মীয়বর্গের প্রতি লক্ষ্য রাখা আমি আমার নিজ আত্মীয়বর্গের প্রতি লক্ষ্য রাখা অপেক্ষা অধিক পছন্দ করি ও গুরুত্ব দান করিয়া থাকি। (অর্থাৎ হযরতের আত্মীয়বর্গ মাথার উপরে কিন্তু হযরতের আদেশ সর্বাগ্রে।)

ব্যাখ্যা ঃ আবু বকর (রাঃ) যে পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা অতি সুস্পষ্ট ছিল। রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সম্পত্তির উপর স্বীয় কর্তৃত্ব জিয়াইয়া রাখাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি শুধু বিবি ফাতেমা (রাঃ)-কেই উক্ত সম্পত্তি হইতে ফিরাইয়া দিয়াছিলেন না। যদি তাহা বণ্টিত হইত তবে তাঁহার কন্যা আয়েশা (রাঃ) এবং ওমরের কন্যা হাফ্সা (রাঃ)ও অংশীদার হইতেন, কিন্তু তিনি কাহাকেও কোন অংশ দেন নাই। আবু বকরের উদ্দেশ্য ছিল, এই সম্পত্তি সম্পর্কে হযরতের নির্দেশ পালন করিয়া যাওয়া, যাহার উল্লেখ বিভিন্ন হাদীছে রহিয়াছে।

অবশ্য ফাতেমা (রাঃ) এবং আলী (রাঃ) এই ব্যাপারে আবু বকর রাযিয়াল্লাল্লাহু তাআলা আনহুর প্রতি মনঃক্ষুণ্ন হইয়াছিলেন। এমনকি এই ব্যাপারটি বোখারী শরীফের ৪৩৫ এবং ৬০৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রহিয়াছে। উক্ত বর্ণনা মতে ফাতেমা (রাঃ) আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর প্রতি এই ব্যাপারে অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু হযরতের স্পষ্ট নির্দেশের দরুন অপারগ ছিলেন।

ব্যাপারটা হয়ত এইরূপ ছিল যে, ফাতেমা (রাঃ) ও আলী (রাঃ) এ সম্পত্তিকে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উত্তরাধিকারী আত্মীয়বর্গের মধ্যে বণ্টন করতঃ তাঁহাদিগকে মোতাওয়াল্লী বানাইয়া দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। অপর পক্ষে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর আশঙ্কা এই ছিল যে, হযরতের স্পষ্ট নির্দেশ অনুসারে এইসব সম্পত্তি আল্লাহর নামে দানকৃত; ইহা একবার ভাগ-বণ্টনের আওতায়

আসিয়া গেলে পরবর্তীকালে ইহার বাস্তব রূপটা নষ্ট হইয়া যাইবে।

আবু বকরের নীতি যুক্তিসঙ্গত ছিল, কিন্তু ফাতেমা (রাঃ) ও আলী (রাঃ) হযরতের ঘনিষ্ঠতা সূত্রে তাঁহাদের যে অধিকার ছিল, সেই অধিকার দাবী করিয়াছিলেন। ব্যাপারটা অতি সাধারণ; সুমপর্যায়ের ব্যক্তিবর্গের মধ্যে এই ধরনের মতবিরোধ বিশেষ কোন গুরুতর বলিয়া বিবেচিত হয় না।

কিন্তু শিয়া সম্প্রদায়, যাহারা আবু বকর (রাঃ) ও ওমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর প্রতি ঈমানহীনরূপে ক্ষেপিয়া আছে, তাহারা আলোচ্য বিষয়টিকে ভয়ানক ঘোলাটে করিয়া দেখাইয়া থাকে। অথচ ঘটনা অতি সাধারণ ছিল। আবু বকর (রাঃ) স্বয়ং ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে রাজি করিয়া নিয়াছিলেন। (সীরাতে মোস্তফা, ৩–২৬৬, ব-হাওয়ালা বেদায়া ওয়ান-নেহায়া)। স্বল্পকালের মধ্যে ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার মৃত্যু হইয়া যাওয়ার পর স্বয়ং আলী (রাঃ) আবু বকর (রাঃ)-কে নিজ গৃহে সংবাদ দিয়া আনিয়াছিলেন এবং সম্মুখে পরস্পর সব কথাবার্তা মন খোলাভাবে বলিয়া দিয়া অতপর সর্বসমক্ষে আনুষ্ঠানিকরূপে উভয়ের মিল-মিশের ঘোষণা জানাইয়া দিয়াছিলেন, যাহার বিবরণ নিম্নের হাদীছে অতি সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

১৭৫৩। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৬০৯) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের যে সম্পত্তি মদীনায় এবং ফদক এলাকা ও খয়বরে ছিল– এই সবের মীরাস দাবী করিয়া হযরতের কন্যা ফাতেমা (রাঃ) আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। আবু বকর (রাঃ) তদুত্তরে বলিলেন, হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, আমাদের তথা নবীগণের সম্পত্তির ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারী কেহ হইবে না; আমাদের পরিত্যক্ত সব কিছু সদকা পরিগণিত হইবে। অবশ্য মুহাম্মদের (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) পরিবারবর্গ এই সম্পত্তি হইতে ভরণ-পোষণ লাভ করিবে।

আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, খোদার কসম রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সদকাহকে আমি এক তিলও পরিবর্তন করিতে পারি না; তাহা পূর্বাবস্থার উপরই বহাল থাকিবে– যে অবস্থায় হযরতের আমলে ছিল। আমি ঐরূপেই তাহা পরিচালনা করিব যেরূপ হযরত (সঃ) করিতেন। এই বলিয়া আবু বকর (রাঃ) ঐ সম্পত্তি ফাতেমা (রাঃ)-কে বণ্টন করিয়া দিতে অস্বীকার করিলেন। ইহাতে ফাতেমা (রাঃ) তাঁহার প্রতি রাগান্বিত হইয়া চলিয়া আসিলেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত (এই ব্যাপারে) আর তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাতও করেন নাই, কথাও বলেন নাই। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পরে ফাতেমা (রাঃ) মাত্র ছয় মাস জীবিত ছিলেন।

(আলী (রাঃ)-ও আবু বকর (রাঃ)-এর প্রতি মনক্ষুণ্ন ছিলেন, এমনকি) ফাতেমা (রাঃ)-এর ইন্তেকাল হইলে পর আলী (রাঃ) রাত্রি বেলায়ই তাঁহার কাফন-দাফন কার্য সমাধা করিয়া দিলেন, আবু বকর (রাঃ)-কে সংবাদ জানাইলেন না।

ফাতেমা (রাঃ) জীবিত থাকাবস্থায় লোকদের মধ্যে আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর প্রতি একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল, কিন্তু ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার ইন্তেকাল হইলে পর আলী (রাঃ) অনুভব করিলেন যে, লোকদের সেই আকর্ষণ লোপ পাইয়া গিয়াছে। এতদদৃষ্টে আলী (রাঃ) আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সঙ্গে মীমাংসায় উপনীত হওয়া এবং তাঁহার প্রতি প্রকাশ্যে সমর্থন জ্ঞাপনের জন্য আগ্রহশীল হইলেন এত দিন আলী (রাঃ) আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর প্রতি সেইরূপে সমর্থন জ্ঞাপনের ঘোষণা দিয়াছিলেন না।

সেমতে আলী (রাঃ) আবু বকর (রাঃ)-কে এই মর্মে সংবাদ দিয়াছিলেন যে, আপনি আমার গৃহে তশরীফ আনিবেন, আপনার সঙ্গে অন্য কেহ যেন না আসেন– উদ্দেশ্য এই ছিল যে, ওমর (রাঃ) যেন সঙ্গে না থাকেন। ওমর (রাঃ) ইহা অবগত হইয়া আবু বকর (রাঃ)-কে বলিলেন, কসম খোদার! আপনি একা তাহাদের গৃহে যাইতে পারিবেন না। আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, তাহাতে আশঙ্কার কি আছে? আমাকে কি করিবে? অতপর আবু বকর (রাঃ) তথায় উপস্থিত হইলেন।

প্রথমে আলী (রাঃ) ভাষণদানপূর্বক আবু বকর (রাঃ)-কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আমরা আপনার মর্তবা এবং আল্লাহ তাআলা আপনাকে যে উচ্চ মর্যাদা দান করিয়াছেন সেই সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকেফহাল রহিয়াছি এবং তাহা স্বীকারও করি। আল্লাহ তাআলা আপনাকে যে উচ্চাসনের অধিকারী করিয়াছেন তাহার জন্য আমরা মোটেও কোন হিংসা করি না, কিন্তু আমাদের অভিযোগ এই যে, আপনি ক্ষমতা-কর্তৃত্ব পরিচালনার ব্যাপারে একনায়কত্বের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন! অথচ রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জ্ঞাতি গুষ্ঠি ও নিকটতম আত্মীয় হওয়া সূত্রে এই ব্যাপারে আমাদেরও দাবী ছিল বলিয়া আমরা মনে করি।

আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বক্তব্য শ্রবণে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর চক্ষুদ্বয় হইতে অশ্রু বহিয়া পড়িল। অতপর তিনি এই বলিয়া বক্তব্য আরম্ভ করিলেন যে, ঐ মহান খোদার কসম যাঁহার ক্ষমতাধীন আমার জান-প্রাণ, নিশ্চয়ই রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আত্মীয়তার মর্যাদা আমার নিকট আমার নিজের আত্মীয়তার মর্যাদা অপেক্ষা অনেক বেশী, কিন্তু আপনার ও আমার মধ্যে হযরতের এই জায়গা-জমির ব্যাপারে যেই মতানৈক্যের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা সম্পর্কে আমি উত্তম পথ অবলম্বনে বিন্দুমাত্র অবহেলা করি নাই এবং এই পর্যন্ত আমি ঐ জমি সম্পর্কে এমন একটি কাজও ছাড়ি নাই যাহা রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে করিতে দেখিয়াছি।

অতপর আলী (রাঃ) বলিলেন, আনুষ্ঠানিকরূপে আপনার প্রতি সমর্থন ঘোষণার জন্য আগামীকল্য দিনের দ্বিতীয়ার্ধে ওয়াদা রহিল। সেমতে পরবর্তী দিন আবু বকর (রাঃ) যোহরের নামাযান্তে মসজিদের মিম্বরে আরোহণ করিলেন এবং ভাষণদানপূর্বক আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর উল্লেখ করিলেন এবং তাঁহার তরফ হইতে প্রকাশ্যে সমর্থন ঘোষণায় বিলম্ব হওয়ার ওজর যাহা তিনি পেশ করিয়াছেন বর্ণনা করিলেন এবং নিজের সকল দোষ-ত্রুটির জন্য আল্লাহ তাআলার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

তারপর আলী (রাঃ) ভাষণ দানপূর্বক আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর যোগ্যতার প্রতি অতিশয় সম্মান প্রদর্শন করিলেন এবং বলিলেন, তাঁহার প্রতি সমর্থন ঘোষণা বিলম্ব করার কারণ তাঁহার প্রতি হিংসা পোষণ এবং তাঁহার খোদা-প্রদত্ত মর্যাদাকে উপেক্ষা করা নহে। হাঁ– আমাদের ধারণা এই যে, কর্তৃত্ব পরিচালনার ব্যাপারে আমাদেরও পরামর্শ দানের অধিকার রহিয়াছে– সেই ক্ষেত্রে তিনি একনায়কত্বের ভূমিকা গ্রহণ করায় আমরা মনঃক্ষুণ্ন হইয়াছিলাম। (এই বলিয়া আলী (রাঃ) আবু বকর (রাঃ)-এর প্রতি অগ্রসর হইয়া আসিলেন এবং সর্বসমক্ষে তাঁহার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থনের ঘোষণা প্রদান করিলেন। (মুসলিম)

এই মিল-মহব্বত প্রকাশে মুসলমানগণ অতিশয় খুশী হইলেন এবং আলী (রাঃ)-কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন। এই শুভকার্য সম্পাদিত হইলে পর মুসলমানগণ আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর প্রতি অধিক সৌজন্যশীল হইয়া উঠিলেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ উল্লিখিত জায়গা-জমি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর খেলাফতকাল পর্যন্ত তাঁহার তত্ত্বাবধানেই পরিচালিত হইত। ওমর (রাঃ) খলীফা হইলে পর দুই বৎসরকাল ঐ অবস্থায় চলিল। অতপর আলী (রাঃ) এবং আব্বাস (রাঃ) তাঁহার নিকট এই অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন যে, অন্তত মদীনাস্থ জমির পরিচালনার ভার প্রদানে আমাদিগকে উহার মোতাওয়াল্লী বানানো হউক। রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের চাচা এবং চাচাত ভাই– এইরূপ ঘনিষ্ঠ হইয়াও তাঁহারা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পরিত্যক্ত সম্পত্তির সম্পর্ক হইতে বঞ্চিত থাকিবেন– ইহাই তাঁহাদের পক্ষে পীড়াদায়ক ছিল, যদ্দরুন তাঁহারা এই ব্যাপারে এত অধিক তৎপরতা দেখাইতেন। ওমর (রাঃ) তাঁহাদের এই অভিপ্রায় এতটুকু পূরণ করিলেন যে, মদীনাস্থ বনু নযীর মহল্লার জমি ভাগ-বন্টন ব্যতিরেকে আব্বাস (রাঃ) ও আলী (রাঃ)-কে একত্রে মোতাওয়াল্লী বানাইয়া দিলেন। কিছু দিন পর পরিচালন ব্যাপারে তাঁহাদের মাঝে মতবিরোধের সৃষ্টি হইল। সেমতে তাঁহারা পুনরায় ওমর (রাঃ)-এর নিকট যাইয়া ঐ জমি বণ্টন করতঃ প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন অংশের মোতাওয়াল্লী বানাইতে বলিলেন। ওমর (রাঃ) ঐ জমি কোন প্রকার ভাগ-বণ্টন করিতে কঠোরভাবে অস্বীকার করিলেন। বিস্তারিত

বিবরণ নিম্নের হাদীছে রহিয়াছে–

১৭৫৪। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৪৩৪ ও ৫৭৫) মালেক ইবনে আওস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি খলীফাতুল মুসলেমীন ওমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নিকট তাঁহার আহ্বানে উপস্থিত হইলাম। এমতাবস্থায় তাঁহার দারোওয়ান আসিয়া সংবাদ দিল যে, ওসমান (রাঃ), আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ), যোবায়ের (রাঃ) এবং সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) উপস্থিত হইয়াছেন– তাঁহারা আপনার সাক্ষাত চাহেন। ওমর (রাঃ) তাঁহাদের সাক্ষাতের অনুমতি দিলেন। তাঁহারা নিকটে আসিয়া সালাম করতঃ বসিয়া পড়িলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই দারোয়ান আসিয়া পুনঃ সংবাদ ছিল, আলী (রাঃ) এবং আব্বাস (রাঃ)ও আসিয়াছেন। ওমর (রাঃ) তাঁহাদিগকেও অনুমতি দিলেন, তাঁহারও উপস্থিত হইয়া সালাম করতঃ বসিলেন।

অতপর (হযরতের চাচা) আব্বাস (রাঃ) ওমর (রাঃ)-কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে আমীরুল মোমেনীন! আমার এবং ইহার (আলী (রাঃ)-এর) মধ্যে একটি চূড়ান্ত ফয়সালা করিয়া দিন। তাঁহারা উভয়ে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পরিত্যক্ত বনু নজীর বস্তির সম্পত্তির তত্ত্বাবধান কার্য পরিচালনার ব্যাপারে মতবিরোধের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়ে পরস্পর কঠোর ভাষা প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। তথায় উপস্থিত ওসমান (রাঃ) এবং তাঁহার সঙ্গীগণও এই ব্যাপারে জোর দিলেন যে, হাঁ– তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে (ভাগ-বন্টন করিয়া দিয়া) চূড়ান্ত ফয়সালা করতঃ পরস্পরের মধ্যে শান্তির ব্যবস্থা করিয়া দেওয়াই উত্তম।

ওমর (রাঃ) সকলকে বলিলেন, একটু থামুন। আমি আসমান-যমীনের রক্ষাকর্তা মহান আল্লাহর কসম দিয়া আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, আপনারা জানেন কি যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, কেহ আমাদের (তথা নবীগণের) ওয়ারিস হইতে পারিবে না, আমাদের পরিত্যক্ত সব কিছু সদকা পরিগণিত হইবে– এই কথার দ্বারা হযরত (সঃ) নিজের বিষয়ই উদ্দেশ করিয়াছিলেন। ওসমান (রাঃ) ও তাঁহার সঙ্গীগণ একবাক্যে বলিলেন, হাঁ– হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) ইহাই বলিয়াছিলেন। অতপর ওমর (রাঃ) আলী (রাঃ) ও আব্বাস (রাঃ)-এর প্রতি বিশেষরূপে লক্ষ্য করতঃ আল্লাহর কসম দিয়া তাঁহাদিগকেও জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারাও কি জানেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) ঐরূপ বলিয়াছেন? তাঁহারা উভয়ে স্বীকার করিলেন, হাঁ– হযরত (সঃ) ঐরূপ বলিয়াছেন।

তখন ওমর (রাঃ) তাঁহাদের সকলকে বলিলেন, আমি আপনাদিগকে মূল বৃত্তান্ত শুনাইতেছি। এই বলিয়া তিনি পবিত্র কোরআন সূরা হাশরের একটি আয়াত তেলাওয়াত করিয়া বলিলেন, বিনা যুদ্ধে আল্লাহ তাআলা যে জায়গা-জমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হস্তগত করিয়া দিয়াছিলেন, উক্ত আয়াত নাযিল করিয়া সেই জমির পূর্ণ অধিকারও আল্লাহ তাআলা রসূলুল্লাহ (সঃ)-কেই দিয়াছিলেন। (এই শ্রেণীর অধিকার একমাত্র রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জন্যই হইয়ছিল, অন্য কাহারও পক্ষে এইরূপ হইবে না)। কিন্তু খোদার কসম! হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) ঐরূপ জায়গা-জমিসমূহ সকলকে বাদ দিয়া একাই সবগুলি কুক্ষিগত করিয়াছিলেন না, বরং সবই মুসলমানদের মধ্যে ভাগ-বন্টন করিয়া দিয়াছিলেন। শুধুমাত্র এই সামান্য (বনু নজীর মহল্লার) জমিটুকু (এবং "ফদক" এলাকাটুকু) নিজের জন্য রাখিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা হযরত (সঃ) স্বীয় পরিবারবর্গের পূর্ণ বৎসরের খোরপোষের ব্যবস্থা করিতেন। ইহার আয়ের মধ্যেও যাহা অতিরিক্ত থাকিত তাহা লিল্লাহরূপে দান-খয়রাত (বা সমরাস্ত্র সংগ্রহে*) ব্যয় করিয়া দিতেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় জীবনকালে এই পন্থায়ই উক্ত জমির কার্য চালাইয়া গিয়াছেন। ওমর (রাঃ) স্বীয় বক্তব্যের উপর উপস্থিত সকলকে কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা কি এই বিবরণ অবগত আছেন? সকলেই উত্তর করিলেন, হাঁ।

ওমর (রাঃ) বলিলেন, অতপর যখন হযরত (সঃ) ইহজগত ত্যাগ করিয়া গেলেন তখন আবু বকর (রাঃ) তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া ঐ জমির পরিচালনা নিজ হস্তে রাখিলেন এবং রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি

* বন্ধনীর মধ্যবর্তী বিষয়বস্তু মুসলিম শরীফে উল্লেখ আছে। (ফতহুল বারী, ৬–১৫৫)

অসাল্লামের পন্থায়ই কাজ চালাইয়া গেলেন। এই সময় ওমর (রাঃ) আব্বাস ও আলী (রাঃ)-কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তখন আপনারা আবু বকরের সমালোচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু আল্লাহ তাআলা সাক্ষী আছেন যে, আবু বকর (রাঃ) এই ব্যাপারে সত্যের প্রতীক, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাতা, হক পথের পথিক ছিলেন। তারপর আবু বকর (রাঃ) ইহজগত ত্যাগ করিলেন এবং আমি তাঁহার স্থলে বসিয়া ঐ জমির পরিচালনা-ভার গ্রহণ করিলাম এবং দুই বৎসরকাল রসূলুল্লাহ (সঃ) এবং আবু বকরের পন্থায় আমি উহার পরিচালনা করিলাম। আল্লাহ তাআলা সাক্ষী যে, আমি সত্য, ন্যায় ও হকভাবে তাহা পরিচালনা করিয়াছি।

অতপর আপনারা দুই জন আমার নিকট উপস্থিত হইয়া একই দাবী পেশ করিলেন। হে আব্বাস! আপনি ত চাচা হওয়ার সূত্রে ভাতিজার অংশ দাবী করিলেন এবং আলী স্বীয় স্ত্রীর পক্ষে তাঁহার পিতার অংশ দাবী করিলেন। তখন আমি আপনাদিগকে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ঐ কথাই শুনাইলাম যে, কেহ তাঁহার উত্তরাধিকারী হইবে না, তাঁহার পরিত্যক্ত সব সাদকা পরিগণিত হইবে। তারপর আমার রায় হইল যে, মদীনাস্থ জমিটা আপনাদের হাওলা করি। সেমতে আমি আপনাদের উভয়কে ডাকিয়া বলিলাম যে, মোতাওয়াল্লীস্বরূপ এই জমির পরিচালনার ভার আপনাদের হস্তে ছাড়িয়া দিতে পারি এই শর্তে যে, আপনারা আল্লাহর নামে ওয়াদা অঙ্গীকার করিবেন যে, ইহার সমুদয় কার্য রসূলুল্লাহ (সঃ), আবু বকর (রাঃ) এবং আমি মোতাওয়াল্লী হইয়া এ যাবত যেই পন্থায় চালাইয়াছি, আপনারাও ঠিক সেই পন্থায়ই চালাইবেন। তখন আপনারা উভয়েই বলিয়াছিলেন, এইভাবেই আমাদিগকে প্রদান করুন। আমি উক্ত শর্তের উপর আপনাদিগকে মোতাওয়াল্লী বানাইয়াছিলাম। এস্থলেও উপস্থিত সকলকে তিনি কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার বক্তব্য ঠিক কি-না? সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিলেন, হাঁ-ঠিকই।

অতপর ওমর (রাঃ) আলী (রাঃ) ও আব্বাস (রাঃ)-কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, ঐ ব্যবস্থার পরে আপনারা আমার নিকট হইতে ভিন্ন কোন নূতন ব্যবস্থার আশা রাখেন? মহান আল্লাহর শপথ করিয়া বলিতেছি, যাঁহার আদেশে আসমান-যমীনের অস্তিত্ব কায়েম রহিয়াছে, আমার পূর্ব ব্যবস্থা ভিন্ন নূতন কোন ব্যবস্থারই অবকাশ আমি দিব না। আপনারা ঐ ব্যবস্থানুযায়ী কাজ চালাইতে অপারগ হইলে তাহা আমার হস্তে প্রত্যর্পণ করুন, আমিই আপনাদের স্থলে কার্য পরিচালনা করিয়া যাইব।

অতপর ঐ জমি সদকারূপে আলী (রাঃ)-এর তত্ত্বাবধানেই পরিচালিত হয়। আব্বাস (রাঃ)-এর কর্তৃত্ব অপসারিত হইয়া যায়। আলী (রাঃ)-এর পরে তাহা পুত্র হাসান (রাঃ)-এর থাকে, তারপর হোসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুর, তারপর হোসাইনের পুত্র আলী– জয়নুল আবেদীন এবং হাসানের পুত্র হাসান– এই দুই জনের তত্ত্বাবধানে থাকে। তাঁহারা উভয়ে সময়ের ভিত্তিতে ভাগ করিয়া নিয়াছিলেন– কিছুকাল একজন এবং কিছুকাল অপরজন; এইভাবে তাঁহারা উহার তত্ত্বাবধান করিতেন। তাঁহাদের পর হাসানের পুত্র যায়েদের তত্ত্বাবধানে ছিল। এই জমি হযরত (সঃ) কর্তৃক প্রদত্ত সদকারূপেই পরিচালিত ছিল।

নবী (সঃ)-এর মীরাস সম্পর্কে বিশেষ বিধান তিনি নিজেই বলিয়া গিয়াছিলেন, ফাতেমা (রাঃ) তাহা অবগত ছিলেন না। তাই মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকার সম্পর্কে যে সাধারণ বিধান আছে, সেই মতেই ফাতেমা (রাঃ) আবু বকর (রাঃ)-এর নিকট অংশীদারীর দাবী সম্পর্কে যুক্তি দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, আপনি মরিয়া গেলে আপনার ওয়ারিস কে হইবে? আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমার পরিজন ও সন্তানগণ। ফাতেমা (রাঃ) বলিলেন, তবে আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ওয়ারিস হইব না কেন? তখন আবু বকর (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাদীছ শুনাইলেন যে, নবীগণের সম্পত্তির কেহ ওয়ারিস হয় না, তাহা সদকা পরিগণিত হয়। সেমতে ফাতেমা (রাঃ) সদকারূপেই উহার পরিচালনার দাবী করিলেন। কিন্তু আবু বকর (রাঃ) ঐ জমি ওয়ারিসদের হস্তগত হইতে দেওয়া, অদূর ভবিষ্যতে তাহা মীরাসে পরিগণিত হওয়ার আশঙ্কায় উহাতে রাজি হইয়াছিলেন না; তাহাতে ফাতেমা (রাঃ) অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু আবু বকর (রাঃ) তাঁহাকে বুঝাইয়া সন্তুষ্ট করিতে কৃতকার্য হইয়াছিলেন।

এক নজরে

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের

তিরোধান

হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম দশম হিজরীর শেষার্ধে রব্বুল আলামীনের তরফ হইতে তাঁহার পরকাল যাত্রার বিভিন্ন ইঙ্গিত লাভ করেন। যথা–

(১) প্রতি রমযান মাসে জিব্রাঈল (আঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সঙ্গে পবিত্র কোরআন দাওর করিতেন– কোরআন শরীফ (যতটুকু অবতীর্ণ হইয়াছে) একে অপরকে শুনাইতেন। এই বৎসর জিব্রাঈল (আঃ) দুইবার দাওর করিলেন। এই সম্পর্কে স্বয়ং নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার নিকট দুইবার দাওর করার উল্লেখপূর্বক বলিলেন, মনে হয় আমার পরকালের যাত্রা নিকটবর্তী আসিয়া গিয়াছে।

(২) সূরা "ইযা জাআ নাছরুল্লাহি" অবতীর্ণ হইয়া নবী (সঃ)-কে জ্ঞাত করা হইল যে, দুনিয়ার বুকে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করার যে উদ্দেশে আপনাকে পাঠানো হইয়াছিল সে উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। সেমতে এই সূরার ইঙ্গিত ইহাই ছিল যে, এখন আর আপনার দুনিয়াতে থাকার প্রয়োজন নাই। ওমর (রাঃ), ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীগণও এই ইঙ্গিত লক্ষ্য করিয়াছিলেন। এক হাদীছে আছে– সূরা "ইযা জাআ নাছরুল্লাহি" নাযিল হইলে পর নবী (সঃ) জিব্রাঈল (রাঃ)-কে বলিলেন, এই সূরায় ত আমার মৃত্যুর ইঙ্গিত দান করা হইয়াছে। জিব্রাঈল (আঃ) বলিলেন, আপনার জন্য দুনিয়া অপেক্ষা আখেরাত উত্তম। (তাবরানী– সীরাতে মোস্তফা, ২–৩৭৪)

এইসব ইঙ্গিত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মনে দাগ কাটিয়াছে; সেমতে তিনি আখেরাতের কাজের মাত্রা বাড়াইয়া দিলেন। সর্বপ্রথম তিনি কোরআন শরীফের দাওর দুই বারের ব্যবস্থা দেখিয়াই দশম হিজরীর রমযান মাসে এতেকাফ সাধারণ নীতি দশ দিনের স্থলে বিশ দিন করিলেন।

এতদ্ভিন্ন দশম হিজরীর হজ্জের সময় আসিলে তিনি ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে বিপুল আয়োজনের সহিত সকল উম্মতকে সঙ্গে লইয়া অন্তিম সফরের পূর্বে শেষ বারের মত হজ্জ সমাধা করার প্রস্তুতি নিলেন। আখেরাতে আল্লাহর দরবারে হাযির হওয়ার লগ্নে দুনিয়াতে তাঁহার ঘরের হজ্জ করিয়া আসা নিতান্তই সঙ্গতি পূর্ণ। এই হজ্জের এক বিশেষ মুহূর্তে কোরআন পাকের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ আয়াত নাযিল হইয়া নবী (সঃ)-কে তাঁহার মহা যাত্রার আর একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দান করিল।

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ـ

অর্থ ঃ "আজ তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করিয়া দিলাম, আমার নেয়ামত (দ্বীনে-ইসলাম) পূর্ণ-পরিণত করিয়া দিলাম এবং তোমাদের জন্য ধর্মরূপে একমাত্র ইসলামকে আমার পছন্দনীয় সাব্যস্ত করিলাম।" এই আয়াতের ইঙ্গিতও নবী (সঃ) উপলব্ধি করিতে পারিলেন যে, যেই দ্বীন-ইসলামের প্রতিষ্ঠার জন্য দুনিয়াতে আমার আগমন হইয়াছিল তাহা পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। অতএব দুনিয়া হইতে আমার গমন অবধারিত। সেমতে হযরত নবী (সঃ) সর্বসাধারণ সমক্ষে তাঁহার ইহজগত ত্যাগের কথা সর্বপ্রথম প্রকাশ করিলেন সেই ঐতিহাসিক বিদায় হজ্জের মহাসম্মেলনে। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সম্মুখে তাহাই ছিল ইসলাম জগতের সর্বাধিক বড় সমাবেশ। কম-বেশী এক লক্ষ ত্রিশ হাজার মুসলমানের সমাবেশ ছিল তাহা। সম্পূর্ণ অচল বা অক্ষম নিতান্ত বাধাগ্রস্ত ব্যতীত কোন মুসলমান বিদায় হজ্জে অনুপস্থিত ছিল বলিয়া মনে হয় না।

উক্ত মহাসম্মেলনের ভাষণে নবীজী (সঃ) তাঁহার ইহধাম ত্যাগের ইঙ্গিত নানা রকমে দিয়াছিলেন।

হযরত (সঃ) তাঁহার বক্তব্যের প্রতি পূর্ণ মনোযোগী করার উদ্দেশে ভাষণের প্রারম্ভে সুস্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিয়াছিলেন– "হে জনমণ্ডলী"! আগামী বৎসর হয়ত এই স্থানে তোমরা আমার সাক্ষাত আর পাইবে না।"

উক্ত ভাষণে নবী (সঃ) মুসলিম জাতির জন্য চির দিনের সুদৃঢ় ভিত্তির উল্লেখে ইহাও বলিয়াছিলেন– "আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর মহাগ্রন্থ রাখিয়া গেলাম; যদি তোমরা উহাকে সুদৃঢ়রূপে ধরিয়া থাক তবে কখনও পথভ্রষ্ট হইবে না।"

রসূলুল্লাহ (সঃ) ঐ ভাষণে অত্যন্ত আবেগপূর্ণ ভাষায় ইহাও বলিলেন– হে মুসলিমগণ! একদা খোদার সম্মুখে তোমাদের হাযির হইতে হইবে; খবরদার! আমি চলিয়া যাওয়ার পর তোমরা পথভ্রষ্ট হইয়া পড়িও না এবং একে অপরের গলা কাটিও না।

ঐ ভাষণের শেষ পর্যায়ে নবী (সঃ) তাঁহার উম্মতের জনসমুদ্র হইতে স্বীয় কর্তব্য সম্পাদন ও দায়িত্ব পালনের সাক্ষ্য আহরণে সকলকে প্রশ্ন করা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন– (আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে) তোমাদিগকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে; فما انتم قائلون "তখন তোমরা কি বলিবে? নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের এই প্রশ্নের উত্তরে সমগ্র জনতা সমস্বরে বলিয়াছিল–

نَشْهَدُ اَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَاَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ ـ

অর্থ ঃ "আমরা সাক্ষ্য দিব, নিশ্চয় আপনি (আল্লাহর সব হুকুম আমাদেরকে) পৌঁছাইয়া দিয়াছেন, আপনি (আপনার দায়িত্ব) আদায় করিয়া গিয়াছেন, সকলের সর্বপ্রকার কল্যাণ ও মঙ্গল কামনায় ভাল-মন্দের পার্থক্য দেখাইয়া দিয়াছেন।" এইভাবে উপস্থিত জনতার স্বীকারোক্তি লাভ করার পর নবীজী (সঃ) তাঁহার শাহাদত অঙ্গুলি আকাশের দিকে উত্থিত করিয়া আবার জনতার প্রতি নামাইলেন– এইরূপে মহান আল্লাহর দৃষ্টি জনতার স্বীকারোক্তির প্রতি আকৃষ্ট করাপূর্বক এই স্বীকারোক্তির উপর আল্লাহ তাআলাকে সাক্ষী বানাইতে যাইয়া তিন বার বলিলেন–

اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ ـ

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ! (আমার কর্তব্য সম্পাদন সম্পর্কে জনতার এই সাক্ষ্য) তুমি শ্রবণ কর! হে আল্লাহ! তুমি ইহা শুনিয়া রাখ!! হে আল্লাহ! তুমি (এই স্বীকারোক্তির উপর) সাক্ষী থাক!!!

ভাষণ সমাপ্তে নবী (সঃ) উপস্থিত জনমণ্ডলীকে এই আদেশও করিলেন যে, উপস্থিতগণ অনুপস্থিতগণকে (আমার শিক্ষা ও আদর্শ) অবশ্যই পৌঁছাইয়া দিও।

এতদ্ভিন্ন মিনায় ৩/৪ দিন হজ্জের বিভিন্ন কার্য সম্পাদনকালে ক্ষণকাল পর পরই উম্মতের বিচ্ছেদ -ভাবনা রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বিচলিত করিয়া তুলিত। তিনি প্রায়ই সঙ্গী-সাথী ছাহাবীগণকে বলিতেন, আমার নিকট হইতে শিখিয়া রাখ! আমার কাছ হইতে শিখিয়া রাখ!! হয়ত আমার সহিত তোমাদের হজ্জ করা আর হইবে না।

সর্বাধিক হৃদয়বিদারক দৃশ্য লক্ষাধিক উম্মতকে অশ্রুসজল করিয়া তুলিল তখন, যখন প্রাণাধিক প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ১০ই যিলহজ্জ এই হজ্জ সমাপনার দিনও কোরবানীর দিন তাঁহার সুদীর্ঘ এবং অন্তর নিংড়ানো ঐতিহাসিক ভাষণ সমাপনান্তে প্রাণপ্রিয় লক্ষাধিক উপস্থিত উম্মতের দিকে মুখ করিয়া বিদায়!! বিদায়!!! কণ্ঠে সকলকে ইহজগতের চিরবিদায় দান করিতেছিলেন; যদ্দরুন এই হজ্জকে বিদায়-হজ্জ নামে আখ্যায়িত করা হইয়াছে।

তার পর হজ্জ সমাপনান্তে মক্কা হইতে ১৬ই যিলহজ্জ বুধবার মদীনা পানে যাত্রা করিয়া ৪ দিন পথ চলার পর ১৮ই যিলহজ্জ রবিবার পথিমধ্যে "গাদীরে খোম" নামক স্থানে নবী (সঃ) একটি বিশেষ বিষয়ে বিশেষ

ভাষণ দিয়াছিলেন। সেই বিশেষ ভাষণের প্রারম্ভেও নবী (সঃ) হৃদয়বিদারক কণ্ঠে বলিয়া দিলেন – "হে লোকসকল! আমি মানুষ বৈ নহি; (আর প্রত্যেক মানুষেরই মৃত্যু অবধারিত, সেমতে) আমার নিকট আমার প্রভুর পেয়াদার আগমন অতি নিকটবর্তী হইয়া গিয়াছে; আমিও তাঁহার ডাকে সাড়া দিব।"

দশম হিজরীর শেষ মাস যিলহজ্জ চাঁদের কয়েকটি দিন মাত্র অবশিষ্ট থাকিতে হযরত (সঃ) বিদায় হজ্জের সফর শেষে মদীনায় পৌঁছিয়াই ইহজগত হইতে বিদায় গ্রহণের ভূমিকায় বিদায়ী কার্যকলাপ অতি ব্যবস্থার সহিত দ্রুত সম্পন্ন করিতে লাগিলেন।

প্রথমেই নবী (সঃ) স্বীয় মসজিদের মিম্বরে আরোহণপূর্বক তাঁহার পরবর্তীতে জাতির কর্ণধার হওয়ার যোগ্য কতিপয় ব্যক্তিত্বের আলোচনায় সর্বসমক্ষে ভাষণ দিলেন। পরে রোগ শয্যায় ত এই ব্যাপারে আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-কে নির্ধারিত করার কথা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্তই করিয়া দিয়াছিলেন (ষষ্ঠ খণ্ড, আবু বকর (রাঃ)-এর আলোচনায় মুসলিম শরীফের হাদীছ দ্রষ্টব্য)।

ইসলামকে বাধামুক্ত এবং উহার ক্ষমতা অক্ষুণ্ন রাখায় জাতির কর্ণধারকে সদা সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে– এই মহা কর্তব্য শিক্ষা দানের বিশেষ ভূমিকাও তিনি সম্পাদন করিলেন।

তৎকালীন বিশ্বের সর্ববৃহৎ শক্তি রোমানগণ মুসলিম জাতিকে সদা উৎপীড়ন করিত। এক বৎসর পূর্বে স্বয়ং হযরত (সঃ) বৃহত্তম সৈন্যবাহিনী লইয়া সুদূর তাবুক পর্যন্ত ভয়াবহ কষ্ট-ক্লেশে অভিযান চালাইয়া তাহাদের অগ্রাভিযান পর্যুদস্ত করিয়াছিলেন। তাহাদের বিরুদ্ধেই মুতার জেহাদে হযরতের প্রিয়পাত্র পোষ্যপুত্র যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ) এবং চাচাত ভাই জাফর (রাঃ) শহীদ হইয়াছিলেন। সেই রোমানদের বিরুদ্ধেই প্রয়োজন দেখা দেওয়ায় অন্তিম রোগাক্রান্তির মাত্র দুই দিন পূর্বে ২৮ই সফর সোমবার যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ)-এর পুত্র ওসামা (রাঃ)-কে অধিনায়ক করিয়া সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করিলেন। বুধবার রোগাক্রান্ত হইয়া রোগ শয্যায় বৃহস্পতিবার নিজ হস্তে ঐ বাহিনীর হাতে পতাকা দানের অনুষ্ঠান পরিচালনাপূর্বক যাত্রা করাইয়া দিলেন। অবশ্য সেই বাহিনী যাত্রা করার পরই হযরতের অবস্থার অবনতির সংবাদে যাত্রা মুলতবী রাখে।

রোগাক্রান্ত হইয়া অন্তিম শয্যায় শায়িত হওয়ার পূর্বে ২/৩ দিন প্রিয়নবী (সঃ) বিদায়ী কার্যাবলীতে নিতান্ত ব্যস্ত থাকিতেছিলেন। বিশেষতঃ নিজ সঙ্গী-সাথী জীবনোৎসর্গকারী ছাহাবীগণের এবং স্বীয় উম্মতের স্মরণই যেন প্রিয় নবীজী (সঃ)-কে অহরহ বিচলিত করিতেছিল। তাঁহাদের হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব ব্যথিত হৃদয়ের সহিত তিনি দ্রুত সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। জীবিত সঙ্গী-সাথীগণ হইতে ত বিদায় হজ্জের সমাবেশেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখন জীবনের হারানো সঙ্গীগণ হইতে বিদায় গ্রহণের বেদনা নবীজী (সঃ)-কে প্রথমে ওহুদ পর্বতের নিকটে নিয়া আসিল। এই পর্বতের পাদদেশেই চিরনিদ্রায় শুইয়া আছেন নবীজীর চরণপ্রান্তে থাকিয়া ইসলামের সেবায় আত্ম-বলিদানকারী হযরতের চাচা শহীদ সর্দার হামযা (রাঃ) এবং তাঁহার সঙ্গীগণ। ৭০ জন শহীদানের সমাধির কিনারায় দাঁড়াইলেন নবী (সঃ) এবং স্মরণ করিলেন দীর্ঘ আট বৎসর পূর্বের হৃদয়বিদারক স্মৃতি; ভাসিয়া উঠিল অশ্রুপূর্ণ চোখের সামনে ছিন্ন-ভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শহীদ দেহসমূহ, কাঁদিয়া উঠিল বিদীর্ণ হৃদয়। সেই মুহূর্তে কী প্রাণঢালা আবেগই না বহিয়া পড়িল তাঁহার রোদন জড়ানো কণ্ঠ হইতে! তাঁহাদের জন্য তিনি প্রাণ ভরিয়া দোয়া করিলেন। শহীদানের মৃত দেহ অবিকৃত থাকে; অনেকের মতে নবী (সঃ) ঐ আবেগপূর্ণ মুহূর্তে তাঁহাদের জন্য নিয়মিত জানাযার নামাযও পড়িলেন; ঐ শহীদানের প্রতি আবেগ যেন তাঁহার বিদীর্ণ অন্তর হইতে উথলিয়া উঠিতেছিল!

ওহুদ প্রান্ত হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া সোজা মসজিদে যাইয়া মিম্বরে আরোহণ করিলেন এবং স্বীয় পরকালের যাত্রার সংবাদ সকলকে অবহিত করিয়া বলিলেন, আমি তোমাদের আগেই তোমাদের সুব্যবস্থার জন্য পরপারের দিকে রওয়ানা করিতেছি, আমি (দ্বীন-ইসলামের সেবায় আত্মোৎসর্গ করা সম্বন্ধে প্রভুর দরবারে) তোমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দান করিব। (চির বিদায়ের পর) হাউজে কাউসারের কিনারায় তোমাদের সঙ্গে পুনঃ সাক্ষাতের অঙ্গীকার থাকিল। (হাউজে কাউসার প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে, কল্পনাপ্রসূত বস্তু নহে,)

এখানে বসিয়া আমি তাহা অবলোকন করিতেছি। (উম্মতকে সান্ত্বনাদানে বলিলেন, তোমাদের বর্তমান দারিদ্র্য থাকিবে না।) সমুদয় বিশ্ব সম্পদের চাবি আমাকে প্রদান করা হইয়াছে। (তোমরা তাহা হস্তগত করিতে সক্ষম হইবে। তখনকার অবস্থা মনে করিয়া তোমাদের জন্য আমি দুনিয়াকে অত্যধিক ভয় করিতেছি। এমনকি) আমি এই ভয় করি না যে, তোমরা (পূর্ববর্তী উম্মতের ন্যায় স্বীয় নবীর তিরোধানের পর ব্যাপকভাবে প্রকাশ্য দেব-দেবীর পূজায়) শেরকের মধ্যে লিপ্ত হইবে। কিন্তু আমি তোমাদের জন্য দুনিয়াকে অত্যন্ত ভয় করি যে, তোমরা প্রতিযোগী হইয়া দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হইতে থাকিবে এবং সেই আকর্ষণই তোমাদের ধ্বংস করিবে; যেরূপ তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণকে দুনিয়ার আকর্ষণ ও মোহ ধ্বংস করিয়াছে।

এইভাবে নবীজী (সঃ) জীবিত-মৃত সকল হইতে বিদায় গ্রহণ পর্ব সমাধা করিয়াছিলেন। রোগ শয্যায় শয়নের দিন আসিয়া গিয়াছে– এই শেষ মুহূর্তে মদীনার কবরস্থান জান্নাতুল বাকীতে শায়িত সাথীগণ হইতে বিদায় গ্রহণের পালা আসিল। জান্নাতুল বাকী মদীনার সাধারণ গোরস্থান; এই গোরস্থানে জীবনের অনেক সঙ্গী শুইয়া আছেন– তাঁহাদের হইতে বিদায় গ্রহণের ইঙ্গিত আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে আসিল। ২৯ সফর মঙ্গলবার দিন শেষে ৩০ সফর বুধবার দিনের রাত্র আসিল; গভীর রজনীতে নবী (সঃ) স্বীয় খাদেমকে নিদ্রা হইতে উঠাইয়া বলিলেন, "বাকী" গোরস্থানে যাইয়া তথা সমাহিতদের জন্য মাগফেরাতের দোয়া করিতে আমি আদিষ্ট হইয়াছি। সেমতে হযরত (সঃ) খাদেমকে লইয়া তথায় পৌঁছিলেন এবং নীরবে শায়িত বন্ধুগণকে সালামের সাথে ইহাও বলিলেন যে, শীঘ্রই আমি তোমাদের সাথে মিলিত হইতেছি। অতপর ঐ গোরস্থানবাসীদের জন্য মাগফেরাতের দোয়া করিলেন। বার বার তাঁহাদের জন্য দোয়া করিলেন এবং তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া ইহাও বলিলেন যে, তোমরা যে অবস্থায় রহিয়াছ তাহা জীবিতদের অবস্থার তুলনায় অনেক উত্তম। (জীবিতদের সম্মুখে) অন্ধকার রজনীর ঘনীভূত অন্ধকারের ন্যায় ফেতনা (ভ্রষ্টতায় পতিত হওয়ার কারণসমূহ) ঘনাইয়া আসিতেছে; প্রত্যেক পরবর্তীটি পূর্ববর্তীটি অপেক্ষা ভয়াবহ কঠিন। অতএব তোমাদের অবস্থা অভিনন্দনের যোগ্য।

অতপর খাদেমকে সম্বোধন করিলেন– হে আবু মোআইহবাহ্! আল্লাহ তাআলা আমাকে অধিকার দিয়াছেন দুনিয়ার ধন-সম্পদ, তারপর বেহেশত অথবা আল্লাহর সাক্ষাত ও বেহেশত উভয়টির কোন একটি গ্রহণের। খাদেম প্রথমটি গ্রহণের কথা বলিলেন। নবী (সঃ) বলিলেন, আমি আল্লাহর সাক্ষাত ও বেহেশত গ্রহণ করিয়াছি। (বেদায়া, ৫–২২৪)

এই রাত্রে নবী (সঃ) মায়মুনা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন। গভীর রাত্রে গোরস্থান হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াই নবী (সঃ) শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হইলেন– এই তাঁহার রোগের সূচনা।

ইতিমধ্যে নবী (সঃ) আয়েশা (রাঃ)-কে শিরঃপীড়ায় অস্থির দেখিতে পাইয়া প্রথমে কৌতুক ও সোহাগের ভাষায় আলাপ করিলেন। অতপর স্বীয় অসুস্থতার কথা প্রকাশ করিলেন এবং আয়েশা (রাঃ)-কে বলিলেন, তোমার কী মাথা ব্যথা! মাথা ব্যথা ত আমার!!

এর পরই ব্যথা ও জ্বরে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটিল। রোগের প্রথম দিকে নবী (সঃ) তাঁহার নীতি অনুযায়ী এক এক বিবির গৃহে অবস্থান করিয়া যাইতেছিলেন। শারীরিক অবস্থার অবনতিতে তিনি বিবিগণকে একত্র করিয়া আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার গৃহেই অবস্থানের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। সকলেই তাহাতে একমত হইলেন। তখন নবী (সঃ) অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছেন; তাই মাথায় কাপড় বাঁধিয়া দুই ব্যক্তির কাঁধে ভর করতঃ আয়েশা (রাঃ)-এর গৃহে আসিলেন।

রোগ যাতনায় জর্জরিত ও দুর্বল এই অবস্থায় চাচা আব্বাসের ছেলে ফজলকে ডাকিয়া আনিলেন এবং বলিলেন, আমাকে হাত ধরিয়া মসজিদে নিয়া চল। মসজিদে আসিয়া মিম্বরে আরোহণ করিলেন এবং লোকদের নামাযের জন্য ডাকিতে বলিলেন। তারপর কষ্ট-যাতনার মধ্যেও দাঁড়াইয়া ভাষণ দিলেন– হে লোকসকল! তোমাদের হইতে আমার বিদায় অতি নিকটবর্তী, তোমাদের মধ্যে আমাকে আর দেখিতে পাইবে

না। তোমাদের নিকট আমি একটি জরুরী কথা বলিব; অন্য কাহারও দ্বারা তাহা বলা হইলে যথেষ্ট হইবে না বিধায় আমি নিজেই তোমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলাম। তোমরা লক্ষ্য করিয়া শুন- আমি কাহারও পৃষ্ঠে আঘাত করিয়া থাকিলে আমার পৃষ্ঠ তাহার সম্মুখে উপস্থিত রহিয়াছে-. সে যেন আমার নিকট হইতে প্রতিশোধ নিয়া নেয়; কেহ যেন ভয় না করে, প্রতিশোধ গ্রহণ করিলে আমার মনে আক্রোশ থাকিবে । স্মরণ রাখিও, কাহারও প্রতি আক্রোশ রাখা আমার স্বভাবে নাই। আমার সর্বাধিক ভালবাসা ঐ ব্যক্তির জন্য যে আমার হইতে তাহার হক আদায় করিয়া নিবে অথবা দাবী ছাড়িয়া মাফ করিয়া দিবে। আমি আল্লাহর সাক্ষাতে এমন পাক-সাফ হইয়া যাইতে চাই যে, আমার উপর কাহারও কোন দাবী না থাকে। নবী (সঃ) পুনঃ পুনঃ এই বক্তব্য সকলের সম্মুখে রাখিয়া অন্তিম শয্যায় এক মহা আদর্শ শিক্ষা দিয়া গেলেন যে, "হক্কুল এবাদ" হইতে কিরূপ সতর্ক হওয়া চাই।

রোগ অবস্থায়ও নবী (সঃ) মসজিদে নামাযের ইমামতি করিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু দ্রুত বেগে দিনের পর দিন ক্রমান্বয়ে তাঁহার রোগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এবং শরীর ক্রমশঃ অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। মৃত্যুর চারি দিন পূর্বে বুধবার সূর্যাস্তের পর (বৃহস্পতিবার রাত্রে) মাগরিবের নামাযই তাঁহার ধারাবাহিক ইমামতির শেষ নামায ছিল। এই রাত্রে এশার নামাযে তিনি আসিতে সক্ষম হইলেন না। মাথায় চক্র আসার দরুন বার বার চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হইলেন; নামাযের জন্য উঠিতে চেষ্টা করিতেন কিন্তু মূর্ছা খাইয়া পড়িয়া যাইতেন; অবশেষে আবু বকর (রাঃ)-কে ইমাম হইয়া নামায পড়াইবার আদেশ করিয়া দিলেন।

রবিবার দিন দুপুর পর্যন্ত নবী (সঃ) সময় সময় চেতনা হারাইতেছিলেন। এই দিন তাঁহাকে নিউমোনিয়া রোগের ঔষধ সেবনের ব্যবস্থা করা হইল, কিন্তু তিনি ঔষধ সেবনে অনিচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। তিনি যেন আল্লাহর আহ্বানে সাড়া দিয়া ফেলিয়াছেন, তাই দাওয়া-দোয়া কোনটার প্রতিই আর তাঁহার আকর্ষণ নাই; তাঁহার মনে এই জপনাই আসিয়া গিয়াছে যে, ঊর্ধ্বজগতের বন্ধুর মিলন চাই। কিন্তু ভক্ত-অনুরক্তগণ এই অনিচ্ছাকে ঔষধের প্রতি রোগীর সাধারণ অনীহা মনে করিয়া চেতনা লোপ পাওয়ার সুযোগে তাঁহার মুখে ঔষধ ঢালিয়া দিল। চেতনা ফিরিয়া আসিলে তিনি তাহাদের প্রতি শাস্তিমূলক ব্যবস্থাস্বরূপ সকলকে ঐ ঔষধ খাইতে বাধ্য করিলেন।

কয়েক দিন যাবত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সাধারণ সাক্ষাত হইতে ভক্ত-অনুরক্ত ছাহাবীগণ বঞ্চিত। এমনকি নামাযের জমাতেও আর সাক্ষাত হয় না, তাই তাঁহারা ব্যাকুল অবস্থায় জটলা বাঁধিয়া বসেন এবং কাঁদেন। আনসারগণের এইরূপ এক দৃশ্য দেখিয়া আব্বাস (রাঃ) এবং আবু বকর (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে আনসারগণের অবস্থা জ্ঞাত করিলেন।

আজ তাঁহার জীবনের আর মাত্র একটি দিন বাকী রহিয়াছে। আজ রবিবার। এই রবিবার তিনি দুপুর বেলা সামান্য স্বস্তি অনুভব করিয়াছেন- দীর্ঘ জীবনের সঙ্গী-সাথীগণের সহিত চির বিদায়ের শেষ সাক্ষাত লাভের জন্য তাঁহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। তিনি বিশেষ কায়দায় মাথায় ও গায়ে পানি ঢালিয়া দেহের স্থবিরতা দূর করিলেন এবং মসজিদে যাওয়ার প্রস্তুতি নিলেন, কিন্তু তিনি মাথা ব্যথায় অস্থির এবং দুর্বল- অতি দুর্বল। আয়েশা (রাঃ) করুণ দৃষ্টিতে তাকাইতেছেন, নবী (সঃ) মাথায় কাপড় আঁটিয়া দুই ব্যক্তির কাঁধে ভর করিয়া চলিয়াছেন। এইভাবেও পদচালনায় তিনি সক্ষম নহেন। পদদ্বয় মাটির উপর রেখা টানিয়া যাইতেছিল। এই অবস্থায় তিনি মসজিদে পৌঁছিলেন; তখন যোহরের নামায আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ইমামতিতে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। এমতাবস্থায় হযরত নবী (সঃ) আবু বকরের বাম পার্শ্বে যাইয়া বসিলেন এবং ঐ নামাযেরও ইমাম তিনি হইলেন। আবু বকর (রাঃ) পিছনে হটিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের কণ্ঠস্বর দুর্বলতার দরুন অতি ক্ষীণ এবং তিনি বসিয়া ইমামতি করিতেছেন- তাই আবু বকর (রাঃ)-কে স্বীয় পার্শ্বেই মোকাব্বেররূপে রাখিয়া নামায সমাপ্ত করিলেন।

নামাযের পর নবী (সঃ) চির বিদায়লগ্নে শেষ বারের মত তাঁহার দীর্ঘ দিনের মিম্বরে আরোহণ করিলেন।

একে ত অতিশয় দুর্বল, তদুপরি প্রাণপ্রিয় ছাহাবীগণ হইতে চির বিদায়ের মুহূর্ত; তাঁহার কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হইতে ক্ষীণ, তাই উপস্থিত শোকাভিভূত ভক্তবৃন্দকে মিম্বরের নিকট ঘনাইয়া বসিবার আদেশ করিলেন এবং ভগ্ন হৃদয়ে বেদনা বিজড়িত স্বরে বিদায়ী ভাষণ আরম্ভ করিলেন।

প্রথমতঃ তিনি তাঁহার আখেরাতের সফরকে অগ্রাধিকার প্রদান করার ইঙ্গীত নিজের নাম গোপন রাখিয়া এই ভাষায় উল্লেখ করিলেন যে, আল্লাহ তাআলা তাঁহার জনৈক দাসকে দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ এবং দীর্ঘায়ুর অধিকার দান করিয়াছিলেন, কিন্তু সে তাহার পরিবর্তে আল্লাহর সান্নিধ্যে চলিয়া যাওয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তারপর আনসারগণের সুদীর্ঘ আলোচনা করিলেন; তাহাদিগকে স্বীয় ভিতর-বাহিরের বন্ধু আখ্যায়িত করিয়া ইসলামের জন্য তাঁহাদের কোরবানী দানের এবং দায়িত্ব পালনের স্বীকৃতি দিলেন। তারপর সকল উম্মতকে অসিয়ত করিলেন, আনসারদের সেবার পূর্ণ স্বীকৃতি দানের এবং তাঁহাদের প্রতি সহিষ্ণু হওয়ার। এই ভাষণে নবী (সঃ) বিশেষভাবে নবী-পয়গম্বরগণের কবর সেজদা করার উপর লানত অভিশাপের কথা অত্যন্ত জোরালো ভাষায় ব্যক্ত করিলেন এবং বলিলেন, খবরদার! আমার কবরকে তোমরা দেবতা বানাইও না– এই কাজ হইতে আমি পুনঃ পুনঃ তোমাদের নিষেধ করিতেছি। এই ভাষণে নবী (সঃ) আবু বকর (রাঃ)-এর আত্মত্যাগ ও ইসলামের সেবার অতুলনীয় স্বীকৃতি দানপূর্বক তাঁহার বৈশিষ্ট্যের ঘোষণা করিলেন।

এই ভাষণের পর নবী (সঃ) আর লোকসমক্ষে আসিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার অন্তরের অন্তস্তলে উম্মতের হিত কামনা এবং কল্যাণ ও মঙ্গলের বাসনা এতই বদ্ধমূল ছিল যে, অন্তিম রোগের ভীষণ যাতনাও তাঁহাকে তাহা মুহূর্তের জন্য ভুলাইতে পারিত না। অসহ্য যাতনা ও সীমাহীন দুর্বলতার মধ্যে তাঁহার শেষ শয্যাকক্ষ আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার গৃহে শয্যাপার্শ্বে ছাহাবীগণকে সমবেত করিলেন। সকলকে সম্বোধনপূর্বক করুণা বিজড়িত কণ্ঠে বলিলেন–

আল্লাহ তাআলা তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষণ করুন, তোমাদের ব্যথা-বেদনা দূর করুন, তোমাদিগকে নেয়ামত দান করুন, সাহায্য দান করুন, উন্নতি দান করুন, আল্লাহ তাআলার আশ্রয়ে তোমরা নিরাপদ হইয়া থাক।

আমি তোমাদিগকে আল্লাহর নামে অসিয়ত করিয়া যাইতেছি, তোমরা ধর্মভীরু হও। আমি তোমাদেরকে আল্লাহর হাতে সোপর্দ করিয়া যাইতেছি। আমি তোমাদেরকে আল্লাহর আযাব হইতে সতর্ক করিয়া যাইতেছি, আল্লাহর পক্ষ হইতে সতর্কবাণী শুনাইয়া যাইতেছি। সাবধান! আল্লাহর যমীনে আল্লাহর বান্দাদের উপর অহঙ্কার ও অন্যায় আচরণ করিও না।

সদা স্মরণ রাখিও, আল্লাহ আমার এবং তোমাদের জন্য বলিয়া দিয়াছেন–

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ۔

অর্থ ঃ "পরকালের শান্তি নিবাস বেহশত আমি সেই সকল লোকদের জন্য নির্ধারিত করিব যাহারা পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য ও অহঙ্কার দেখায় না, বিপর্যয় ঘটায় না এবং সংযমশীল খোদাভীরু লোকগণই পরিণামে কল্যাণ লাভ করিবে।"

আল্লাহ তাআলা আরও বলিয়াছেন– اَلَيْسَ فِىْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِيْنَ

অর্থ ঃ "অহঙ্কারীদের বাসস্থান অবশ্যই জাহান্নামে হইবে।"

ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার শেষ মুহূর্ত কবে? হযরত (সঃ) বলিলেন, বিদায় অতি নিকটবর্তী, যাত্রা আল্লাহর সন্নিধানে এবং চিরস্থায়ী বেহেশতের দিকে।

এতদ্ভিন্ন এই সাক্ষাতে ছাহাবীগণ নবী (সঃ)-কে শেষ নিঃশ্বাসের পর গোসল দান, কাফন পরানো এবং

জানাযার নামায সম্পর্কে প্রশ্নের মাধ্যমে উত্তর সংগ্রহ করিয়া রাখিলেন। অবশেষে উম্মত হইতে শেষ বিদায় গ্রহণে নবী (সঃ) বলিলেন, তোমরা আমার অনুপস্থিত ছাহাবীগণকে আমার সালাম পৌঁছাইয়া দিও এবং কেয়ামত পর্যন্ত যাহারা আমার অনুসারী হইবে তাহাদের সকলের প্রতি আমার সালাম থাকিল।

এতদ্ভিন্ন নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অন্তিম শয্যা ঘনাইয়া আসার সময় হইতে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন ভাষণে উম্মতের জন্য বহু মূল্যবান নসীহত, উপদেশ ও তথ্যাবলী রাখিয়া গিয়াছেন। "অন্তিম শয্যায় নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বিভিন্ন ভাষণ" শিরোনামে তিন পৃষ্ঠাব্যাপী তাহা বর্ণনা করা হইয়াছে। পাঠকগণ ঐ পৃষ্ঠাগুলি বারংবার পাঠ করিবেন।

ইতিমধ্যে এক সময় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের স্ত্রীগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিলেন। এমন সময় সর্বাধিক স্নেহের তনয়া ফাতেমা (রাঃ) তথায় পৌঁছিলেন। নবী (সঃ) ফাতেমা (রাঃ)-কে ক্ষীণ কণ্ঠে স্নেহভরে বলিলেন, হে বৎস!" তোমাকে জানাই মারহাবা! এই বলিয়া স্নেহের কন্যাকে অতি নিকটে বসাইলেন এবং চুপি চুপি স্বীয় বিদায়ের কথা জ্ঞাত করিয়া বলিলেন– আল্লাহকে ভয় করিয়া ধৈর্যধারণ করিও। জানিয়া রাখিও, আমি তোমার উপকারের জন্য উত্তম অগ্রগামী হইয়া যাইতেছি। ফাতেমা (রাঃ) ইহা শুনামাত্র ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে নবী (সঃ) সান্ত্বনা দানে তাঁহার কানে কানে বলিলেন, "তুমি সন্তুষ্ট হও যে, তুমি বেহেশতের মধ্যে নারীগণের সর্দার-মুকুটমণি গণ্য হইবে এবং তুমি শান্ত হও; আমার পরিজনের মধ্যে সর্বাগ্রে তুমিই (ইহজগত ত্যাগ করিয়া) আমার সহিত মিলিত হইবে।" এতদশ্রবণে ফাতেমা (রাঃ) আনন্দে হাসিলেন।

বিশ্ব মানবের নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) এই নশ্বর পৃথিবী হইতে চির বিদায়ের আয়োজনে নিজকে পাথিব অর্থ-সম্পদ হইতে সম্পূর্ণরূপে নিঃস্ব করিয়া নিয়াছিলেন। দুনিয়ার ধন-দৌলত গৃহে রাখিয়া খোদার সাক্ষাতে যাইবেন– ইহাতে যেন তিনি লজ্জাবোধ করিয়াছিলেন। এমনকি শেষ কয় দিনের জন্য পরিবারের আহার যোগাইতে এক ইহুদীর নিকট হইতে ধারে আটা ক্রয় করিয়া স্বীয় লৌহবর্ম বন্ধক রাখিয়া গিয়াছেন। কোন মুসলমানের নিকট হইতে ঐ ধার গ্রহণ করেন নাই এই আশঙ্কায় যে, হয়ত সে স্বীয় সাধ্যের অধিক চাপ সহ্য করিয়া ধার দেওয়ার পরিবর্তে হাদিয়া দানপূর্বক স্বীয় নবীকে ঋণমুক্ত করার চেষ্টা করিবে। নিজের জন্য কোন ভক্তের উপর এই সামান্য চাপের আশঙ্কাও নবী (সঃ) এড়াইয়া গিয়াছেন। এইভাবে মৃত্যুমুখেও নবী (সঃ) দুনিয়া হইতে নির্লিপ্ত থাকার সোনালী আদর্শ শিক্ষা দান করিয়া চলিয়াছেন।

১১ই রবিউল আউয়াল রবিবার– প্রিয় নবী (সঃ) আর মাত্র একটি দিনই পৃথিবীর অতিথি। দুপুর বেলা হইতে তিনি রোগ যাতনার অপেক্ষাকৃত মামুলী লাঘব বোধ করিলেন। স্ববংশীয় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মুরব্বী শ্রেণী এই লাঘবকে নৈরাশ্যব্যঞ্জক গণ্য করিলেন বটে, কিন্তু অন্যরা রোগ প্রকোপের এই লাঘবতায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন। যাঁহারা এতদিন ঘর-বাড়ী ছাড়িয়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সন্নিকটে ভিড় জমাইয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকে এই সুযোগে নিজ নিজ বাড়ী দেখিয়া আসিবার জন্য চলিয়া গিয়াছেন।

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ইহজীবনের সর্বশেষ রাত্রিটি ঐ অবস্থায় কাটিয়াছে। এমনকি পর দিন সোমবার প্রভাতে নবীজীর মসজিদে আবু বকর (রাঃ)-এর ইমামতিতে ফজর নামাযের জামাত আরম্ভ হইয়াছে। জাতির ইমাম তথা পরিচালক নির্ধারণের ইঙ্গিত অর্থে নবী (সঃ) চারি দিন পূর্ব হইতেই আবু বকর (রাঃ)-কে স্বীয় মসজিদের ইমাম বানাইয়া রাখিয়াছেন; তাঁহার পিছনে নির্দ্বিধায় একতাবদ্ধরূপে মুসলমানদের সারিবদ্ধ হওয়ার দৃশ্য অবলোকন করিয়া চোখ জুড়াইবার অভিলাষ তাঁহার মনে উদিত হইল। তাই তিনি শত দুর্বলতা সত্ত্বেও শয্যা হইতে অতি কষ্টে দাঁড়াইয়া কক্ষের দরজার নিকটে আসিলেন। দরজার কপাট ছিল না; চটই উহার আবরণ ছিল– উহা ফাঁক করিয়া আকাঙ্ক্ষিত দৃশ্য দেখার জন্য মসজিদের প্রতি তাকাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভক্তবৃন্দ মুসল্লীগণের দৃষ্টি পড়িয়া গেল তাঁহার প্রতি, এমনকি ইমাম আবু বকর (রাঃ)-এর দৃষ্টিও তাঁহার প্রতি আসিয়া গেল। সকলেই নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পিছনে নামায

পড়ার সুযোগ প্রাপ্তির আশায় আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিল। মুসল্লীগণ নূতনভাবে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পিছনে নিয়ত বাঁধিবার আশায় পূর্ব নিয়ত ছাড়িয়া দিতে এবং আবু বকর (রাঃ)ও মোক্তাদী হওয়ার আশায় ইমামতি ত্যাগ করিয়া পেছনে চলিয়া আসিতে উদ্যত হইলেন। সকলের মধ্যেই চাঞ্চল্য দেখা দিল। নবী (সঃ)ও তাঁহার নির্ধারিত ইমামের পিছনে মুসলমানগণকে শ্রেণীবদ্ধ হওয়ার আকাঙ্ক্ষিত দৃশ্য দেখিয়া আনন্দ লাভ করিলেন। আনন্দের অতিশয্যে তাঁহার চেহারা মোবারক হাস্যোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কিন্তু তিনি ত দুর্বল হইতে দুর্বলতর, হাসির আলোমাখা সুন্দর চেহারাখানি রক্ত শূন্যতার কারণে ফেকাসে দেখাইতেছিল; তিনি ত কিছু সময় দাঁড়াইয়া থকিতেও অক্ষম। তাই ভক্তবৃন্দ ছাহাবীগণকে হাতের ইশারায় নিরাশ করিয়া দরজার আবরণ ছাড়িয়া দিলেন। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের চেহারা মোবারক ছাহাবীগণের নজরে হঠাৎ বিদ্যুৎ ঝলকের ন্যায় আবির্ভূত হইয়া আবার পর্দার অন্তরালে অন্তর্হিত হইয়া গেল। ইহাই ছিল ছাহাবীদের জন্য প্রাণ-প্রিয় নবী (সঃ)-কে জীবিত দেখার সর্বশেষ মুহূর্ত।

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অবস্থা এতটুকু মন্দের ভাল মনে করিয়া নামায শেষে আবু বকর (রাঃ) আজ বাড়ী গেলেন। ইতিমধ্যেই নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অবস্থা নিমিষের মধ্যে গুরতররূপে দ্রুত অবনতি হইতে অবনতির দিকে মোড় নিয়া নিল। পরিবার-পরিজনের মধ্যে হায়-হুতাশের রোল পড়িয়া গেল।

এক দিকে আকাশের সূর্য উদয়ের পথে আগমন করিতেছিল, অপর দিকে কুল মখলুকাতের সূর্য অস্তের দিকে গমন করিতেছিল। পত্নীগণ সকলেই উপস্থিত আছেন, স্নেহের তনয়া ফাতেমা (রাঃ)ও ছুটিয়া আসিয়াছেন। পয়গম্বরী আকাশের সূর্য অস্তের দিকে যাইতে যাইতে ম্লান হইয়া আসিতেছে। মৃত্যুর স্বাভাবিক যাতনা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। চেহারার রং ঘন ঘন পরিবর্তন হইতেছে; চেতনা লোপ পাইতেছে আবার ফিরিয়া আসিতেছে– এইরূপে মৃত্যুর মুহূর্ত ঘনাইয়া আসিতে লাগিল।

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের এই যাতনার দৃশ্য ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার জন্য অসহনীয় হইয়া উঠিল; তিনি কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িলেন এবং বলিতে লাগিলেন, হায়! আমার আব্বার কী কষ্ট!! নবী (সঃ) ম্লান কণ্ঠে বলিলেন, এই সময়ের পরে তোমার আব্বার আর কোন কষ্ট থাকিবে না। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রতিটি মুহূর্ত নিতান্ত অস্থিরতার মধ্যে কাটিতেছিল, এমতাবস্থায়ও তিনি আদর্শ প্রচারে ক্ষান্ত ছিলেন না। শায়িত অবস্থায় গায়ে চাদর ছিল; অস্থিরতার দরুন মুখে মাথায় চাদর টানিয়া দিতে লাগিলেন, আবার শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার উপক্রমে তাহা অপসারিত করিতেছিলেন– এই অস্থিরতার মধ্যেও স্বীয় উম্মতের জন্য সতর্কবাণী রাখিয়া যাইতেছিলেন– "ইহুদ-নাসারাদের উপর আল্লাহর লা'নত; তাহারা তাহাদের পীর-পয়গম্বরগণের কবরকে সেজদার স্থান বানাইয়াছিল।

যাতনার দরুন অস্থিরতা চরমে পৌঁছিয়াছে; কী অবস্থায় শান্তি অনুভব করিবেন তাহাই যেন খুঁজিতে ছিলেন। মাথা একবার বালিশ হইতে সরাইয়া আয়েশার উরুর উপর রাখিলেন। আয়েশা (রাঃ) শেষ বারের মত একটি তদবীর করিতে চাহিলেন। তিনি শেফা তথা আরোগ্যের জন্য বিশেষ দোয়া পড়িয়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামর মুখ মণ্ডলে হাত বুলাইতে লাগিলেন। নবী (সঃ) তাহাতে বাধা দিয়া বলিলেন, বরং আমি ত সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধুর মিলন চাই। রবিবার দিন তিনি ঔষধ সেবনে অনীহা প্রকাশ করিয়াছিলেন; আজ তিনি বাঁচার পক্ষে দোয়ার তদবীরেও বাধা দিলেন। (বেদায়া, ৫–২৪০)। কারণ, এই সময় ত তিনি মহাযাত্রার আরম্ভে রহিয়াছেন। এই সঙ্কট মুহূর্তেও নবী (সঃ) উম্মতের হিত কামনা ভুলেন নাই। উম্মতকে সতর্ক করার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। আলী (রাঃ)-কে ডাকিয়া আনিলেন এবং কিছু লিখিয়া দিয়া যাওয়ার কোন বস্তু নিয়া আসিতে আদেশ করিলেন। তাঁহার অবস্থা এতই সঙ্কটের মধ্যে ছিল যে, আলী (রাঃ) আশঙ্কা করিলেন, ঐ বস্তুর জন্য উঠিয়া গেলে হয়ত ফিরিয়া আসিয়া নবীজী (সঃ)-কে আর পাইবেন না। তাই আলী (রাঃ) বলিলেন, যাহা লিখাইতে চাহেন মুখে বলিয়া দিন; আমি তাহা সযত্নে স্মরণ রাখিব। নবী (সঃ) বলিলেন,

(উম্মতের জন্য) আমি শেষ অসিয়ত করিয়া যাইতেছি- নামায, যাকাত এবং করতলগত অধীনস্থদের প্রতি বিশেষ বিশেষ লক্ষ্য রাখার।

শেষ মুহূর্ত আসিয়া গিয়াছে। মৃত্যু যাতনার প্রাবল্যে কোন অবস্থার উপর স্থিরতা সম্ভব হইতেছিল না। এই সময় প্রিয়তমা বিবি আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার বক্ষের সহিত হেলান দিয়া আছেন, কণ্ঠনালীতে গরগর শব্দ হইতেছে, শ্বাসনালী আবদ্ধ হইয়া আসিতেছে, মুখে জড়তা আসিয়া গিয়াছে। শুধুমাত্র উম্মত এবং ব্যক্তিগত ধ্যানই হৃদয়পটে আছে। উম্মতের জন্য বার বার বিড়বিড় শব্দে বলিতেছিলেন- আস্সালাহ্, আস্সালাহ্... "সাবধান!! নামায, নামায এবং করতলগত অধীনস্থ।" আর নিজের জন্য শুধু সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু আল্লাহ তাআলার সহিত মিলনাকাঙ্ক্ষা প্রকাশে নিম্নবর্ণিত বুলিসমূহই বার বার উচ্চারণ করিতেছিলেন।

(১) আয় আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি দয়া কর, উর্ধ্বজগতের বন্ধুদের সহিত আমার মিলন করাইয়া দাও। (২) ঐ লোকদের সাথী বানাইয়া দাও যাঁহাদের উপর আল্লাহর বিশেষ নেয়ামত বর্ষিত হইয়াছে, অর্থাৎ নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ এবং নেককারগণ; তাঁহারাই হইতেছেন উত্তম সাথী। (৩) আয় আল্লাহ! সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধুর মিলন চাই।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, এই পরিস্থিতিতে আমরা সুস্পষ্ট বুঝিয়া নিলাম, নবী (সঃ) আর আমাদের নিকট থাকিতেছেন না। তিনি মৃত্যু যাতনায় নিতান্তই অস্থির; আল্লাহর সান্নিধ্যে যাত্রা করিবেন- এই মুহূর্তে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মেসওয়াক করিয়া মুখ পরিষ্কার করার ইচ্ছা উদিত হইল; সঙ্গে সঙ্গে তাহার ব্যবস্থাও হইয়া গেল। ঐ সময়ই আয়েশা (রাঃ)-এর ভ্রাতা মেসওয়াকের একখানা ডালা হাতে তথায় উপস্থিত হইলেন। আয়েশা (রাঃ) উহার প্রতি তাঁহার আকর্ষণ অনুভব করিয়া চিবাইয়া মোলায়েম করিয়া দিলেন। নবী (সঃ) তাহা দ্বারা সুন্দর মত মেসওয়াক করিলেন। নিকটবর্তী একটি পাত্রে পানি ছিল, তাহাতে তিনি উভয় হাত ভিজাইয়া মুখমন্ডল শীতল করিতে লাগিলেন এবং অসহনীয় যাতনার মধ্যে বলিতেছিলেন- "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মৃত্যুর যাতনা অনেক।"

এই অবস্থায় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এই দোয়াও করিতেছিলেন-

اللهم اعنى على سكرات الموت -আয় আল্লাহ! মৃত্যুর যাতনা ও কষ্ট উপশমে আমাকে সাহায্য করুন। (তিরমিযী শরীফ)

অস্ত্রোপচারে পীর-পয়গম্বর সকলেরই ব্যথা-যন্ত্রণা হওয়া স্বাভাবিক; মৃত্যু ত বড় হইতে বড় অস্ত্রোপচার অপেক্ষা কঠিন।

অতপর উপরের দিকে হস্ত উত্তোলন করিয়া বলিতে লাগিলেন-

فى الرفيق الاعلى সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধুর মিলনে চলিলাম -এই বাক্য উচ্চারণের সাথে সাথেই উত্তোলিত হস্তদ্বয় শিথিল হইয়া পড়িয়া গেল এবং সাইয়্যেদুল মোরসালীন মাহবুবে রব্বুল আলামীন ইহজীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ছাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া আছ্হাবিহী অসাল্লাম।

"ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন"

রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মৃত্যুতে তাঁহার শোকাভিভূত পরিবার-পরিজনকে সর্বপ্রথম সান্ত্বনা দান করিয়াছেন হযরত খিজির (রাঃ)। তিনি অদৃশ্য থাকিয়া শুধু কণ্ঠস্বরে গৃহকোণ হইতে শুনাইয়াছেন- হে গৃহবাসী! আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। নিশ্চয় আল্লাহর (রহমতের) মধ্যে নিহিত রহিয়াছে সব রকম দুঃখ-বিপদের সান্ত্বনা, সর্বপ্রকার হারানো বস্তুর বিনিময়, সকল রকম ক্ষয়-ক্ষতির ক্ষতিপূরণ। অতএব আপনারা সকলে আল্লাহকে ভয় করিবেন এবং একমাত্র তাঁহার হইতেই সব কিছুর আশা রাখিবেন। নিশ্চয় প্রকৃত বিপদগ্রস্ত একমাত্র ঐ ব্যক্তি যে (ধৈর্যহারা হইয়া বিপদের) সওয়াব হইতে বঞ্চিত থাকে। (কণ্ঠস্বর শুনিয়া) আলী (রাঃ) বলিলেন, তোমরা জান তিনি কে? তিনি হইলেন খিজির (আঃ)। (মেশকাত শরীফ, ৫৫০)

রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ওফাতে ছাহাবীগণের সকলের উপর শোকের তুফান বহিয়া যাইতেছিল, সকলেই বিহ্বল অচেতন হইয়া পড়িয়াছিলেন। এমনকি লৌহ মানব ওমর ফারুক (রাঃ)সহ অনেক ছাহাবীর চেতনাই লোপ পাইয়া গেল। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মৃত্যু স্বীকার করার মত বোধশক্তিও তাঁহারা হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। একমাত্র আবু বকর (রাঃ)-ই ঐ মুহূর্তে বাহ্যিক ধীরস্থিরতা রক্ষা করিয়া চলিতেছিলেন। গায়েবী নির্দেশ অনুসারে নবী (সঃ)-কে তাঁহার গায়ে জামা রাখিয়াই গোসল দেওয়ার পর তিনখানা সাদা সূতি কাপড়ে কাফন পরানো হইল, যেই জামায় গোসল দেওয়া হইয়াছিল উহা অপসারণ করা হইল। তারপর একমাত্র নবীগণের জন্য ব্যবস্থারূপে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার কক্ষেই বুগলী কবর তৈয়ার করিয়া শবদেহ কবরের কিনারায় রাখিয়া দেওয়া হইল। নিয়মিত জানাযা পড়া হইল না। কারণ, নবীগণের মৃত্যু বস্তুতঃ মৃত্যু হয় না। তাঁহাদের পবিত্র আত্মা দেহের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে, শুধুমাত্র তাহার ক্রিয়াকলাপ ধুলার ধরণীর মধ্যে থাকে না। এই কারণেই নবীগণের স্ত্রীদের অন্যত্র বিবাহ হইতে পারে না, তদ্রূপ জানাযারও প্রয়োজন হয় না। অবশ্য শবদেহ সম্মুখে রাখিয়া দরূদ-সালাম পাঠ করা হইতেছিল। প্রথমে ফেরেশতাগণ দরূদ ও সালাম পাঠ করিয়াছেন, তারপর মুসলমান পুরুষগণ, তারপর মহিলাগণ, তারপর অপ্রাপ্ত বয়স্কগণ, তারপর দাস-দাসীগণ পর্যন্ত। এইভাবে সোমবার দ্বিপ্রহরের পর হইতে দুই বা তিন দিন পর্যন্ত দরূদ-সালাম পাঠ করা হয়। সেই যুগে দূর-দূরান্তে সহজ ও দ্রুত যোগাযোগের কোন ব্যবস্থা মোটেই ছিল না, পার্বত্য এলাকার লোকসংখ্যা বেশী ছিল না। মদীনা ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকার ত্রিশ হাজার মানুষ দলে দলে দরূদ-সালাম পাঠ করেন। তারপর মঙ্গলবার বা বুধবার দিনের পর রাত্রে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের দেহ মোবারক কবরে আবৃত করিয়া দেওয়া হয়। আলী (রাঃ), আব্বাস (রাঃ) এবং আব্বাসের পুত্রদ্বয় ফজল ও কুসাম (রাঃ)– এই চারি জন দেহ মোবারক কবরে অবতীর্ণ করেন।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! আসুন– প্রিয়নবী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের তিরোধান বিবরণ ঐ দরূদ-সালামের উপরই ক্ষান্ত করি, যে দরূদ-সালাম পাঠে তাঁহাদের ভক্ত-অনুরক্ত ছাহাবীবৃন্দ তাঁহাকে ইহজগত হইতে চির বিদায় দিয়াছিলেন।

লোকদের মধ্যে সর্বপ্রথম আবু বকর ও ওমর (রাঃ) এবং সমাধিস্থ কক্ষে যে পরিমাণ সামাই হয় সেই সংখ্যক বিশিষ্ট মোহাজের ও আনসারগণ উপস্থিত হইলেন। ইমাম মোক্তাদীর জামাত নহে, কিন্তু আবু বকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ) সকলের অগ্রভাগে শবদেহের বরাবরে দাঁড়াইলেন, অন্যরা তাঁহাদের পিছনে কাতারবন্দীভাবে দাঁড়াইলেন। নিম্নে বর্ণিত সালামের বাক্যসমূহ প্রত্যেকেই উচ্চারণ করিলেন আর অপর বাক্যসমূহ আবু বকর ও ওমর (রাঃ) পাঠ করিলেন এবং অন্যরা "আমীন আমীন" বলিতে থাকিলেন।

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ ـ

হে মহান নবী ! আপনার প্রতি সালাম এবং আল্লাহর সর্বপ্রকার রহমত ও মঙ্গল (বর্ষিত হউক।

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَشْهَدُ اَنَّهٗ قَدْ بَلَّغَ مَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ وَنَصَحَ لِاُمَّتِهٖ ـ

আয় আল্লাহ! আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে, প্রিয়নবী (সঃ) নিশ্চয় পৌঁছাইয়াছিলেন জগদ্বাসীকে যাহা কিছু তাঁহার প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং তিনি তাঁহার উম্মতের কল্যাণ ও মঙ্গলের সব কিছু বাতলাইয়া গিয়াছেন।

وَجَاهَدَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَتّٰى اَعَزَّ اللّٰهُ دِيْنَهٗ وَتَمَّتْ كَلِمَتُهٗ ـ

আর তিনি আল্লাহর দ্বীনের জন্য সংগ্রাম করিয়াছেন– যাহার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁহার দ্বীনকে শক্তিশালী করিয়াছেন এবং তাঁহার বিধানাবলী পূর্ণ বাস্তবায়িত হইয়াছে।

وَاُوْمِنُ بِهٖ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ فَاجْعَلْنَا اِلٰهَنَا مِمَّنْ يَّتَّبِعُ

এবং শরীকবিহীনরূপে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান গ্রহণ করা হইয়াছে। অতএব, হে আমাদের মাবুদ।! আমাদের ঐ লোকদের দলভুক্ত রাখুন যাহারা অনুসরণ করে–

اَلْقَوْلَ الَّذِىْ اُنْزِلَ مَعَهٗ وَاجْمَعْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهٗ ـ

ঐ বাণীর যাহা তাঁহার সঙ্গে প্রেরিত হইয়াছে। আর আমাদের তাঁহার সহিত মিলিত করিবেন (কেয়ামত দিবসে) ;

حَتّٰى تُعَرِّفَهٗ بِنَا وَتُعَرِّفَنَا بِهٖ فَانَّهٗ كَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُفًا رَّحِيْمًا ـ

এমনকি তাঁহার নিকট আমাদের পরিচয় করাইয়া দিবেন এবং আমাদেরকেও তাঁহার পরিচয় করাইয়া দিবেন। নিশ্চয় তিনি ঈমানদারদের প্রতি মেহেরবান ও দয়ালু ছিলেন।

لاَ تَبْتَغِىْ بِالْاِيْمَانِ بِهٖ بَدِيْلاً وَلاَ نَشْتَرِىْ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلاً ـ

এই মহান নবীর প্রতি ঈমানের বিনিময়ে কখনও আমরা কিছু গ্রাহ্য করিব না এবং তাঁহার (ভালবাসার) বিনিময়ে জগতের কোন মূল্যই গ্রহণ করিব না। (বেদায়া, ৫-২৬৫)

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِىِّ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

নিশ্চয় আল্লাহ এবং তাঁহার ফেরেশেতাগণ নবীজীর প্রতি দরূদ পাঠাইয়া থাকেন। হে মোমেনগণ! তোমরাও তাঁহার প্রতি দরূদ পাঠ কর এবং সালাম প্রেরণ কর।

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ صَلٰوةُ الْبَرِّ الرَّحِيْمِ وَالْمَلٰئِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ ـ

আয় আল্লাহ! আয় আমাদের পরওয়ারদেগার! আমরা উপস্থিত হইয়াছি, আমরা আপনার (দরূদ ও সালামের) আদেশ যথাযথ পালন করিব। সর্বাধিক মঙ্গলকামী দয়াল প্রভুর দরূদ (রহমত) এবং নৈকট্যধারী সমস্ত ফেরেশতাগণের দরূদ–

وَالنَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالصّٰلِحِيْنَ وَمَا سَبَّحَ لَكَ مِنْ شَىْءٍ يَارَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

এবং নবীগণের, সিদ্দীকগণের ও সমস্ত নেককারগণের দরূদ, আর যত বস্তু আপনার তসবীহ পাঠ করিয়া থাকে– সকলের দরূদ হে রব্বুল আলামীন! কবুল করিয়া নিন–

عَلٰى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ خَاتِمِ النَّبِيِّيْنَ ـ وَسَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ـ وَاِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ ـ

আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদের জন্য, যিনি নবীগণের শেষ নবী, রসূলগণের সর্দার এবং মোত্তাকীগণের প্রধান।

وَرَسُوْلِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ الشَّاهِدِ الْبَشِيْرِ الدَّاعِىْ بِاِذْنِكَ ـ

এবং তিনি সারা জাহানের প্রভুর রসূল, তিনি সত্যের মাপকাঠি, সুসংবাদদানকারী এবং আপনার আদেশে জগদ্বাসীকে আহ্বানকারী –

السِّرَاجُ الْمُنِيْرُ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ ـ

তিনি দীপ্ত প্রদীপ। আর তাঁহার উপর সকল প্রকার বরকত, কল্যাণ ও মঙ্গল বর্ষণ করুন এবং সালাম-শান্তি বর্ষণ করুন। (মাদারেজুন নবুয়ত)

নবীজী মোস্তফা (সঃ)-এর গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য

হযরতের অঙ্গ-সৌষ্ঠব ঃ (পৃঃ ৫০১)

১৭৫৫। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫০২) আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের দৈহিক গঠন মধ্যম শ্রেণীর ছিল– অতি লম্বাও নহে, একেবারে বেঁটে খর্বকায়ও নহে। শরীরের রং অতি উজ্জ্বল ছিল, ফেকাসে সাদাও ছিল না, ময়লা শ্রেণীর শ্যামবর্ণও ছিল না। মাথার চুল অধিক কুঞ্চিতও

ছিল না, সম্পূর্ণ সোজাও ছিল না– মামুলী বাঁকযুক্ত সুশৃঙ্খল ছিল।

চল্লিশ বৎসর বয়সকালে তাঁহার প্রতি ওহী নাযিল হওয়া আরম্ভ হয় এবং তাঁহার নবুয়ত প্রকাশ হয়, অতপর তিনি মক্কায় দশ বৎসর এবং মদীনায় দশ বৎসর অতিবাহিত করেন। ইহজগত ত্যাগকালে তাঁহার মাথা ও দাড়ির মধ্যে সর্বমোট কুড়িটি চুলও সাদা হইয়াছিল না।

ব্যাখ্যা ঃ উল্লিখিত সময়ের হিসাব শুধু একটা মোটামুটি হিসাব, নতুবা সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ওহী নাযিলের আরম্ভকাল চল্লিশ বৎসর হইতে কয়েক মাস, কয়েক দিন ও কয়েক ঘণ্টার বেশ কম হইবে। কারণ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম রবিউল আউয়াল মাসের ১২ই তারিখে ভোর বেলা ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন এবং রমযান মাসের শেষের দিকে কোন এক তারিখে লাইলাতুল কদরের রাত্রে সর্বপ্রথম ওহীপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এই সূত্রে চল্লিশ বৎসর হইতে কিছু কম বেশী হওয়া অবধারিত।

মক্কায় অবস্থান সম্পর্কেও তদ্রূপই; অন্যান্য সূত্রে মক্কায় অবস্থানকাল তের বৎসর সাব্যস্ত হইয়াছে। আলোচ্য হাদীছে দশকের উপর ভাঙ্গা সংখ্যা ধরা হয় নাই।

১৭৫৬। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫০২) বরা ইবনে আযেব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সর্বাধিক সুশ্রী ও সচ্চরিত্রবান ছিলেন। তাঁহার দৈহিক গঠনও সুন্দর ছিল; অধিক লম্বাও ছিলেন না এবং অধিক বেঁটেও ছিলেন না।

১৭৫৭। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৮৭৬) আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মাথা অপেক্ষাকৃত বড় আকারের ছিল (যাহা জ্ঞানবান ব্যক্তিত্বশালী পুরুষের আকৃতি) এবং তাঁহার পায়ের পাতা পুরু, বড় ও মজবুত ছিল। পূর্বে বা পরে তাঁহার তুল্য (অঙ্গ সৌষ্ঠববিশিষ্ট) কাহাকেও দেখিতে পাই নাই। হযরতের হাতের তালু সুপ্রশস্ত ছিল।

১৭৫৮। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫০২) বরা ইবনে আযেব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের দৈহিক আকৃতি মধ্যম শ্রেণীর এবং তাঁহার কাঁধদ্বয়ের মধ্যস্থল সুপ্রশস্ত ছিল (অর্থাৎ তাঁহার বক্ষ বা সিনা মোবারক অপেক্ষাকৃত চওড়া ছিল)। তাঁহার মাথার চুল উভয় কানের লতি পর্যন্ত পৌঁছিত (–ইহার অধিক লম্বা হইতে দিতেন না)।

আমি তাঁহাকে লাল রংয়ের পোশাকে দেখিয়াছি– তিনি এত সুন্দর দেখাইতেন যে, আমি কাহাকেও তাঁহার তুল্য সুন্দর দেখি নাই।

১৭৫৯। হাদীছ ঃ(পৃঃ ৫০২) বরা ইবনে আযেব (রাঃ)-কে কেহ জিজ্ঞাসা করিল, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের চেহারা মোবারক কি তরবারির ন্যায় (জ্বলজ্বলা লম্বা সাইজের) ছিল? বরা (রাঃ) বলিলেন না–না, তাঁহার চেহারা মোবারক পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় (উজ্জ্বল ও গোলাকৃতির) ছিল।

১৭৬০। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫০৩) আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মোটা বা চিকন কোন প্রকার রেশমী কাপড়ও হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের হস্ত মোবারক অপেক্ষা অধিক কোমল পাই নাই এবং সৃষ্টিগতভাবে হযরতের শরীরে যে সুগন্ধি ছিল তাহা অপেক্ষা অধিক কোন সুগন্ধি আমি কোথাও পাই নাই।

১৭৬১। হাদীছ ঃ আবু জোহায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম (হজ্জের সময়ে মিনা হইতে মক্কা পথে আবৃতাহ নামক স্থানে) দ্বিপ্রহরে (যোহরের নামাযের শেষ ওয়াক্তে তাঁবু হইতে) বাহির হইলেন এবং যোহরের নামায পড়িলেন, অতপর (আছরের নামাযের আউয়াল ওয়াক্তে) আছরের নামায আদায় করিলেন।

তখনকার ঘটনা– লোকেরা সারিবদ্ধরূপে দাঁড়াইল। নবী (সঃ) তাহাদের নিকট দিয়া গমনকালে প্রত্যেকেই (বরকতের জন্য) নবীজীর হস্তদ্বয় দ্বারা নিজ নিজ চেহারা মুছিতে লাগিল। আবু জোহায়ফা (রাঃ) বলেন, আমিও হযরতের হস্ত মোবারক আমার চেহারার উপর রাখিলাম; তখন আমি স্পষ্ট অনুভব করিয়াছি,

হযরতের হস্ত মোবারক বরফতুল্য শীতল এবং মেশক্ বা কস্তুরী অপেক্ষা অধিক সুগন্ধিময়।

আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সময় সময় তাঁহাদের বাড়ী তশরীফ আনিতেন। তাঁহার মাতা) উম্মে সোলায়েম (দুপুর বেলা) হযরতের আরাম করার জন্য চামড়ার বিছানা বিছাইয়া দিতেন। হযরত (সঃ) ঐ বিছানার উপর দুপুর বেলা ঘুমাইতেন। স্বাভাবিকভাবে হযরতের শরীর হইতে অধিক পরিমাণে ঘাম নির্গত হইয়া থাকিত। হযরত যখন ঘুম হইতে উঠিয়া যাইতেন তখন উম্মে সোলায়েম চামড়ার বিছানার উপর হইতে হযরতের ঘাম এবং তাঁহার মাথা হইতে দুই চারিখানা চুল ছিন্ন হইয়া পড়িয়া থাকিলে তাহা কুড়াইয়া কাঁচের শিশিতে জমা করিতেন এবং দেহ হইতে নির্গত ঘাম সুগন্ধির সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিতেন।

একদা হযরত (সঃ) উম্মে সোলায়েমকে ঐসব কুড়াইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কি? উম্মে সোলায়েম আরজ করিলেন, ইহা আপনার শরীরের ঘাম– আমি জমা করিয়া রাখি এবং সুগন্ধি বস্তুর সহিত মিশ্রিত করিয়া থাকি। কারণ, তাহা সর্বাধিক সুগন্ধি; ইহার দ্বারা অন্য সুগন্ধির উৎকর্ষ সাধিত হয়।

উম্মে সোলায়েম ইহাও বলিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! বরকতের জন্য ইহা ছেলে-মেয়েদেরকেও ব্যবহার করাই। হযরত (সঃ) তদুত্তরে বলিয়াছেন, উত্তমই বটে।

হাদীছ বর্ণনাকারী ছাহাবী আনাছ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর শাগরেদ বলিয়াছেন, আনাছ (রাঃ) মৃত্যুকালে অসিয়ত করিয়াছিলেন, হযরতের ঘাম মিশ্রিত সুগন্ধি যেন আমার কাফনে দেওয়া হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর তাহাই করা হইয়াছে।

১৭৬২। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৮৫৭) মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আনাছ (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, হযরত নবী (সঃ) কি খেজাব ব্যবহার করিতেন? তিনি বলিলেন, হযরতের বার্ধক্য এতদূর পৌঁছিয়াছিল না যে, খেজাবের প্রয়োজন হয়। তাঁহার দাড়ি মোবারকের এত অল্প সংখ্যক চুল সাদা হইয়াছিল যে, ইচ্ছা করিলে সহজেই তাহা গণনা করা যাইত।

১৭৬৩। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫০১) আবু জোহায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে দেখিয়াছি, তাঁহার (নিম্ন ওষ্ঠের নিচে) বাচ্চা দাড়ির কতিপয় চুল সাদা হইয়াছিল মাত্র।

১৭৬৪। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫০২) হারীজ ইবনে ওসমান আবদুল্লাহ ইবনে বুসর (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন? তিনি বলিলেন, শুধু তাঁহার বাচ্চা দাড়ির কতিপয় চুল সাদা হইয়াছিল।

১৭৬৫। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫০২) কাতাদা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আনাছ (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কি খেজাব ব্যবহার করিতেন। তিনি বলিলেন, খেজাবের প্রয়োজনই ছিল না; শুধু কেবল তাঁহার মাথার উভয় পার্শ্বের কিছু পরিমাণ কেশ সাদা হইয়াছিল।

১৭৬৬। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫০৩) ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম প্রথমে স্বীয় মাথার বাবরি আঁচড়াইতে মাথার অগ্রভাগে সিঁথি না কাটিয়া অগ্রভাগের চুলগুলিকে গিঁট লাগাইয়া কপালের উপর ছাড়িয়া দিতেন, তৎকালে কিতাবধারী ইহুদী-নাসারাদের রীতিও ইহাই ছিল; মোশরেকগণ কিন্তু সিঁথি কাটিয়া থাকিত। হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) যে কার্যে বিশেষ কোন নিয়মের আদিষ্ট না হইতেন, সেই কার্যে তিনি কিতাবধারীদের রীতিই অগ্রগণ্য মনে করিতেন। (এস্থলে তিনি তাহাই করিতেন, কিন্তু) পরে তিনি সিঁথি কাটিবার রীতিই অবলম্বন করিয়াছিলেন।

হযরত (সঃ)-এর চরিত্র গুণ

১৭৬৭। হাদীছ ঃ (পৃঃ ২৮৫) আবদুল্লাহ ইবনে আম্র (রাঃ) (যিনি তওরাত কিতাবের বিশিষ্ট আলেম ছিলেন,) তাঁহাকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, তওরাত কিতাবে হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি

অসাল্লামের গুণাবলী কিরূপ বর্ণিত আছে, তাহা জানাইবেন কি? তিনি বলিলেন– হাঁ, কোরআন শরীফে বর্ণিত অনেক গুণাবলী তওরাতেও উল্লেখ রহিয়াছে, যেমন পবিত্র কোরআনে আছে–

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّا اَرْسَلْنَا شَاهِداً وَّمُبَشِّراً وَّنَذِيْراً ـ

অর্থ ঃ "হে নবী! আমি আপনাকে রসূলরূপে প্রেরণ করিয়াছি– আপনি বাস্তব সত্য বিশ্ববাসীর সম্মুখে তুলিয়া ধরিবেন এবং সত্য-মিথ্যা, হেদায়াত ও গোমরাহীর সাক্ষ্যদাতা; তথা নমুনা ও মাপকাঠি হইবেন এবং সত্যাবলম্বনকারীদের পক্ষে সুসংবাদদানকারী আর সত্যের বিরোধীগণকে সতর্ককারী হইবেন।"

আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, তওরাত শরীফেও হযরতের এই গুণগুলির উল্লেখ হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে আরও কতিপয় গুণেরও উল্লেখ আছে। যথা– "তিনি অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন বিশ্ব মানবকে রক্ষাকারী (ধর্মের বাহক) হইবেন, আমার বিশিষ্ট বান্দা ও প্রেরিত প্রতিনিধি হইবেন, (আমার উপর পূর্ণ ভরসা ও নির্ভরকারী হইবেন; যদ্দরুন) আমি তাঁহার নাম রাখিয়াছি "মোতাওয়াক্কেল" অর্থাৎ ভরসা স্থাপনকারী। তিনি কঠোর প্রকৃতির– কঠিন আত্মার লোক হইবেন না, (তাঁহার হৃদয় হইবে অতি কোমল। তিনি অতিশয় গাম্ভীর্যপূর্ণ হইবেন, এমনকি পথে-ঘাটে) হাটে-বাজারে হট্টগোল করিয়া বেড়াইবার অভ্যাস তাঁহার মোটেই হইবে না। তিনি এতই সহিষ্ণু হইবেন যে, কাহারও দুর্ব্যবহারের প্রতিরোধ ও প্রতিশোধে তিনি দুর্ব্যবহার করিবেন না বরং ক্ষমা করিবেন। আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে ইহজগত হইতে উঠাইয়া নিবেন না যাবত না তাঁহার মাধ্যমে বক্র পথের পথিক কাফের জাতিকে সোজা করিয়া দেন, তাহারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর স্বীকৃতি দান করে এবং যাবত না তিনি এই কলেমার দ্বারা অন্ধ চক্ষুসমূহকে সত্যের আলো দান করেন, বয়া বধির কর্ণসমূহে সত্য শ্রবণ ও গ্রহণের শক্তি সৃষ্টি করেন, আবদ্ধ অন্তঃকরণ ও বুদ্ধি-বিবেককে সত্যের আলো দান করেন।

১৭৬৮। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫০৩) عن عبد الله به عمر رضى الله تعالى عنه قَالَ لَمْ يَكُنِ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا وَّلاَ مُتَفَحِّشًا وكَانَ يَقُوْلُ اِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ اَحْسَنُكُمْ اَخْلاَقًا ـ

অর্থ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম লজ্জাহীন, অশ্লীল, বিশ্রী কথাবার্তায় অভ্যস্ত ছিলেনই না, ঐরূপ কথা কুত্রাপি মুখেও আনিতেন না। তিনি উপদেশ দিতেন, যাহার চরিত্র ও আচার-ব্যবহার ভাল সে-ই তোমাদের মধ্যে উত্তম।

১৭৬৯। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫০৩) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সম্মুখে কোন্ কার্য সমাধা করার একাধিক পথ-পদ্ধতি থাকিলে তিনি সহজ-সুলভ পথ-পদ্ধতি বাছিয়া লইতেন; অবশ্য তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখিতেন যে, ইহাতে কোন দিক দিয়া শরীয়তের বরখেলাপ গোনাহের কোন কিছু করিতে না হয়। যদি ঐ সহজ-সুলভ পথ-পদ্ধতি গোনাহের কারণ তথা শরীয়তের বরখেলাপ হইত তবে অবশ্যই তিনি ঐ পথ-পদ্ধতি হইতে বহু দূরে থাকিতেন।

আর রসূলুল্লাহ (সঃ) কখনও নিজস্ব কোন ব্যাপারে কাহারও হইতে প্রতিশোধ লইতেন না (ক্ষমা করিতেন)। অবশ্য কেহ আল্লাহর শরীয়তের মর্যাদাহানিকর কোন কাজ করিলে সেস্থলে তিনি আল্লাহর দ্বীনে খাতিরে সুষ্ঠু প্রতিকার বিধান করিতেন।

১৭৭০। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫০৩) আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম অতিশয় লজ্জাশীল ছিলেন– পর্দানশীল কুমারীও তত লজ্জাবতী হয় না। এমনকি রুচি বিরোধী কোন কিছুর সম্মুখীন হইলে তাঁহার চেহারার উপর উহার প্রতিক্রিয়া ভাসিয়া উঠিত (কিন্তু মুখে কিছু বলিতেন না)।

১৭৭১। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫০৩) আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কখনও কোন খাদ্য-বস্তুর প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিতেন না; যদি মনের আকর্ষণ হইত তবে খাইতেন নতুবা খাইতেন না।

১৭৭২। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫০৩) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কথা বলার সময় এইরূপ ধীরে ধীরে কথা বলিতেন যে, তাঁহার শব্দাবলী কেহ গণনা করিতে ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই তাহা করিতে পারিত।

১৭৭৩। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৮৯৩) আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম অশ্লীল কথা কখনও মুখে আনিতেন না, লান্-তান্ অভিশাপ দিতেন না এবং গালি-গালাজ করিতেন না। কাহারও ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইলে শুধু এতটুকু বলিতেন, সে এরূপ করে কেন, তাহার কপালে মাটি পড়ক।

১৭৭৪। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৮৯২) জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট কোন কিছু চাওয়া হইলে কখনও তাঁহাকে 'না' বলিতে শোনা যায় নাই।

১৭৭৫। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৮৯২) আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি দীর্ঘ দশ বৎসরকাল নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের খেদমত করিয়াছি। কখনও তিনি আমাকে তিরস্কার করেন নাই বা কৈফিয়ত চাহেন নাই– এরূপ কেন করিয়াছ? এরূপ কেন কর নাই?

হযরত (সঃ)-এর সাধারণ অভ্যাস

১৭৭৬। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৮৯২) আসওয়াদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বাড়ীর ভিতরে কি কাজে থাকিতেন? তিনি বলিলেন, তিনি গৃহ কর্মও করিয়া থাকিতেন, কিন্তু নামাযের ওয়াক্ত উপস্থিত হইলেই নামাযের জন্য চলিয়া যাইতেন।

১৭৭৭। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৯০০) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, কখনও নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে পূর্ণ মুখে এইভাবে হাসিতে দেখি নাই যে, তাহার আল্‌জিভ নজরে পড়ে। তাঁহার হাসি একমাত্র মুচকি হাসিই ছিল।

হযরতের অনাড়ম্বর জিন্দেগী

১৭৭৮। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৮০৯) আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পরিবারবর্গ একাধারে তিন দিন পেট পুরিয়া খাওয়ার সুযোগ পান নাই, তাঁহার শেষ জীবন পর্যন্ত এই অবস্থাই চলিয়াছে।

১৭৭৯। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৪৩৭) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যখন ইহজগত ত্যাগ করিয়াছেন তখন আমার ঘরে অল্প (মাত্র দুই সের পরিমাণ) যব ব্যতীত খাওয়ার উপযোগী কোন বস্তুই ছিল না (ঐ অল্প পরিমাণ যবের মধ্যে অনেক বরকত পাইতেছিলাম) তাহা আমি মাচাঙ্গের উপর রাখিয়া দিয়াছিলাম; তথা হইতে প্রতিদিন কিছু কিছু পরিমাণ বাহির করিয়া খাইয়া থাকিতাম– এইরূপে দীর্ঘ দিন কাটিল। একদা আমি তাহার সমষ্টি মাপিয়া রাখিলাম, অতপর তাহা সাধারণভাবে নিঃশেষ হইয়া গেল।

১৭৮০। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৮১৪) আবু হয্‌ম (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি সাহ্‌ল ইবনে সা'দ (রাঃ) ছাহাবীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ময়দা (ময়দার রুটি) খাইয়া থাকিতেন কি? তিনি বলিলেন, হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) সারা জীবনে (নিজের ঘরে) ময়দা চোখেও দেখেন নাই।

আবু হয্‌ম (রঃ) বলেন, আমি তাঁহাকে আরও জিজ্ঞাসা করিলাম, হযরতের যমানায় আপনারা (আটার

উৎকর্ষ সাধনে) চালনী ব্যবহার করিতেন কি? তিনি বলিলেন, রসূল (সঃ)ও সারা জীবন (নিজের ঘরে) চালনী চোখে দেখন নাই। জিজ্ঞাসা করিলাম, চালনী ব্যতিরেকে যবের আটা কিরূপে খাইতেন? তিনি বলিলেন, যব পিষিবার পর ফুৎকারে যতদূর সম্ভব ভূষি উড়াইয়া অবশিষ্টের দ্বারা রুটি তৈয়ার করিয়া খাইতাম।

১৭৮১। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৮১৫) একদা ছাহাবী আবু হোরায়রা (রাঃ) একদল লোকের নিকটবর্তী পথে যাইতেছিলেন; ঐ লোকগণ আস্ত বকরী ভুনা করিয়া খাইতেছিল। তাহারা আবু হোরায়রা (রাঃ)-কে খাওয়ায় শরীক হওয়ার জন্য বলিল। আবু হোরায়রা (রাঃ) ঐ সৌখিন খাদ্যে শরীক হইতে অসম্মতি জানাইয়া বলিলেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম দুনিয়া ত্যাগ করিয়াছেন এমতাবস্থায় যে, তিনি যবের রুটিও পেট পুরিয়া খাওয়ার সুযোগ সব সময় পাইতেন না।

১৭৮২। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৮১৫) আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম চেয়ার-টেবিলে খানা খাইতেন না এবং পিরিচ তশ্‌তরী (ইত্যাদি বিলাসিতার পাত্র) ব্যবহার করিতেন না। তাঁহার জন্য রুটিও পাত্‌লা তৈয়ার করা হইত না (সাধারণ মোটা রুটিই খাইতেন)।

হাদীছ বর্ণনাকরীকে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করিল, হযরত (সঃ) টেবিলে খাইতেন না– কিসের উপর খাইতেন? তিনি বলিলেন, হযরত (সঃ) দস্তরখানের উপর খাইতেন।

১৭৮৩। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৮১৫) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মদীনায় আসার পর শেষ জীবন পর্যন্ত তাঁহার পরিবারবর্গ একাধারে তিন দিন গমের রুটি খাইবার সুযোগ পান নাই। (অর্থাৎ এক-দুই দিন গমের রুটি খাওয়ার সুযোগ পাইলেও আবার দুই-চারি দিন যবের রুটি বা খুরমা-খেজুরের উপর অতিবাহিত করিতে হইত। একাধারে গমের রুটি খাইয়া যাইবেন এইরূপ সচ্ছলতা হযরত (সঃ) নিজের জন্য অবলম্বন করেন নাই।)

১৭৮৪। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৯৫৬) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পরিবারর্গ সাধারণত প্রতিদিনের দুই ওয়াক্তের খানার মধ্যে এক ওয়াক্ত খুরমা-খেজুর খাইয়া থাকিতেন। (অর্থাৎ প্রতিদিন দুই ওয়াক্ত রুটি খাওয়ার মত সচ্ছলতা হযরত (সঃ) নিজের জন্য অবলম্বন করেন নাই।)

১৭৮৫। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৯৫৬ পৃঃ) কাতাদা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা ছাহাবী আনাছ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নিকট ছিলাম। তাঁহার বাবুর্চি তাঁহার নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিল, (সে তাঁহার জন্য খাদ্য পরিবেশন করিতেছিল; সে উচ্চ শ্রেণীর খাদ্য তৈয়ার করিয়া আনিয়াছিল। তাহা দৃষ্টে) আনাছ (রাঃ) উপস্থিত সকলকে বলিলেন, এই খাদ্য তোমরা গ্রহণ কর। আমার অবগতি অনুসারে হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সারা জীবন পতলা চাপাতি রুটি (খাইবার জন্য) চোখে দেখারও সুযোগ গ্রহণ করেন নাই এবং ভুনা করা আস্ত বকরী কাবাব (ইত্যাদির ন্যায় সৌখিন খাদ্য) চোখেও দেখেন নাই।

১৭৮৬। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৯৫৬) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা (হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পরিবারবর্গ) পূর্ণ দুই দুই মাস অতিবাহিত করিতাম এমন অবস্থায় যে, একদিনও আমাদের ছুলায় আগুন জ্বলে নাই।

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার ভাগিনা ওরওয়া (রাঃ) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনাদের জীবিকানির্বাহ হইত কিরূপে? আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, পানি এবং খেজুর। অবশ্য কতিপয় পড়শী রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জন্য দুগ্ধ দিয়া থাকিত, তাহা হইতে তিনি আমাদিগকেও পান করাইয়া থাকিতেন।

১৭৮৭। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৯৫৭) عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْ اٰلَ مُحَمَّدٍ قُوْتًا ـ

অর্থ ঃ আবু হেরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এইরূপ দোয়া করিতেন, আয় আল্লাহ! মুহাম্মদ (সঃ)-এর পরিবারবর্গকে খোর-পোষ শুধু আবশ্যক পরিমাণ দান কর।

অর্থাৎ, সাধারণভাবে জীবনধারণে যেন পরের মুখাপেক্ষী হইতে না হয় এবং আবশ্যক পরিমাণ হইতে অধিকও যেন না হয়।

১৭৮৮। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৯৫৬) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বিছানা ছিল চামড়ার, যাহার ভিতরে খেজুর গাছের (মাথার লাল রংয়ের ছাল (কুটিয়া নরম করা) ভরা ছিল।

মোজাদ্দেদে যমান হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রঃ) তাঁহার সীরাত সঙ্কলন 'নশরুত তীব' গ্রন্থে নির্ভরযোগ্য হাদীছ গ্রন্থাবলী হইতে নবীজী মোস্তফা (সঃ)-এর বিভিন্ন গুণাবলীর একটি প্রবন্ধ সংযোজিত করিয়াছেন, তাহার অনুবাদ

নবীজী (সঃ) সৃষ্টিগতভাবেই অতি মহীয়ান গরীয়ান এবং শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। দেহ তাঁহার উজ্জ্বল গৌর বর্ণের সুন্দর ছিল, চেহারা মোবারক পূর্ণ চন্দ্ররূপ গোলাকার, দীপ্ত ও কমনীয় ছিল; পূর্ণ গোল ছিল না। তাঁহার শির অপেক্ষাকৃত বড় ছিল, কেশরাশি স্বভাবতই বিন্যস্ত আঁচড়ানোরূপী ছিল; অধিক লম্বা শুধু এতটুকু করিতেন যে, কানের নিম্নভাগ সামান্য অতিক্রম করিত। ললাট তাঁহার প্রশস্ত ছিল। তাঁহার ভ্রূ সরু, মিহি এবং ঘন ছিল, উভয়টি পৃথক ছিল, মধ্যভাগে একটি ধমনী বা শিরা ছিল, যাহা রাগের সময় ফুলিয়া উঠিত। নাসিকা তাঁহার একটু উঁচু ছিল, যাহার উপর দীপ্ত আভা পরিদৃষ্ট হইত, যদ্দরুন নাসিকা অধিক উঁচু মনে হইত– বস্তুতঃ তত উঁচু ছিল না, মানানসই ছিল। দাড়ি তাঁহার মুখ ভরা এবং খুব ঘন ছিল। চোখের পুতুলী মিশমিশে কাল ছিল, চোখের পাতার লোম দীর্ঘ এবং কাল ছিল, সুরমা ব্যবহার ছাড়াই সুরমা দেওয়া দেখাইত। চোখের সাদা অংশে লাল বর্ণের সরু সরু রেখা চিল, চোখ ছিল দীর্ঘাকারে বড়। মুখ মানানসই বড় ছিল। গণ্ডদ্বয় সুসমতল ছিল; ফুলা-ফাঁপা ছিল না। দাঁতসমূহ অতিশয় সাদা সুবিন্যস্ত ছিল; কথা বলার সময় মনে হইত যেন দাঁতের ফাঁক হইতে নূর বা আলো বিচ্ছুরিত হইতেছে। হাসির সময় দাঁতসমূহ সাদা-শুভ্র শিলার ন্যায় দেখাইত। গ্রীবা তাঁহার এত সুন্দর ছিল যেন হাতে গড়ানো এবং উহার বর্ণ ছিল ঝকঝকে উজ্জ্বল। কাঁধ ও বক্ষ ছিল চৌড়া– প্রশস্ত। কাঁধে, বাহুতে ও বক্ষের ঊর্ধ্ব অংশে লোম ছিল এবং বক্ষ হইতে নাভি পর্যন্ত লোমের সরু ধারা ছিল; ইহা ব্যতীত অবশিষ্ট দেহ লোমহীন ছিল। পেট এবং বক্ষ সমতল ছিল, অবশ্য বক্ষ কিঞ্চিত স্ফীত ছিল। হাত লম্বা সাইজের ছিল, পাঞ্জা প্রশস্ত এবং পুরু ছিল। আঙ্গুলসমূহ দীর্ঘ ছিল। ধমনী বা শিরাসমূহ স্ফীতিহীন দেহের মিলে ছিল। বাহু এবং হস্তদ্বয় মোটা– গোশ্তপূর্ণ ছিল। পায়ের গোছাও ঐরূপ ছিল। পায়ের পাতা পুরু সমতল ও মসৃণ ছিল। তাহা হইতে পানি গড়াইয়া পড়িয়া যাইত। পায়ের তলার মধ্যস্থ খোঁচ অপেক্ষাকৃত বেশী ছিল। পায়ের গোড়ালি শীর্ণ ও চাপা ছিল। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জোড়াগুলি মজবুত শক্তিশালী ছিল– জোড়ার হাড়ের অগ্রভাগ মোটা মোটা ছিল। সম্পূর্ণ দেহই পরিপূর্ণ জমাট বাঁধারূপ ছিল। সমুদয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই অত্যন্ত মানানসই ছিল।

নবীজী (সঃ)-এর চালচলন

নবী (সঃ) হাঁটিবার সময় পা হেঁচড়াইয়া চলিতেন না– পা উঠাইয়া উঠাইয়া সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া অবনত দৃষ্টিতে চলিতেন; যেন উঁচু হইতে নীচুর দিকে চলিতেছেন। তিনি নম্র ও বিনয়ীর ন্যায় চলিতেন, দীর্ঘ পদক্ষেপে চলিতেন। তাঁহার পথ এত দ্রুত অতিক্রান্ত হইত যেন তাঁহার জন্য পথ ছোট হইয়া গিয়াছে। তাঁহার স্বাভাবিক গতির চলাচলেও তাঁহার সঙ্গে চলিতে আমরা ক্লান্ত হইয়া পড়িতাম। তাঁহার উঠা বসা

আল্লাহর যিক্‌রের উপর হইত। নবীজী (সঃ) কাহারও প্রতি তাকাইলে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাইতেন। অবনত দৃষ্টি ছিল তাঁহার স্বভাব– তাঁহার দৃষ্টির গতি ঊর্ধ্বপানে অপেক্ষা নিম্নপানেই বেশী ছিল। তাঁহার সাধারণ দৃষ্টিপাত বিনত চোখে হইত। সাধারণতঃ নবীজী (সঃ) পথ চলিতে ছাহাবীগণকে আগে চালাইতে চেষ্টা করিতেন। যাহারই সঙ্গে দেখা হইত নবীজী প্রথমে সালাম করায় সচেষ্ট হইতেন।

নবীজী (সঃ)-এর চারিত্রিক গুণাবলী

নবী (সঃ) সদা ভাবগম্ভীর ও চিন্তামগ্ন থাকায় অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি আনন্দ-উল্লাস করিতেন না, প্রয়োজন ছাড়া কথা বলিতেন না। যেই কথায় সওয়াব হওয়ার আশা ঐরূপ কথাই বলিতেন। দীর্ঘ সময় নীরব থকিতেন। কথা বলিলে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় কথা বলিতেন এবং অত্যন্ত মিষ্টভাষী ছিলেন। অল্প কথায় অনেক উদ্দেশ্যবোধক উক্তি করিয়া থাকিতেন। তাঁহার কথা ধীরে ধীরে হইত। প্রয়োজন অপেক্ষা অতিরিক্ত কথা বলিতেন না, অস্পূর্ণ এবং কমও বলিতেন না। তাঁহার বচন মুক্তার মালার ন্যায় হইত। কোমলভাষী ছিলেন; কঠোর প্রকৃতির ছিলেন না, কাহারও প্রতি ঘৃণা করিতেন না। আল্লাহর নেয়ামত অতি ছোট হইলেও সম্মান করিতেন; আল্লাহর কোন নেয়ামতের কুৎসা করিতেন না। কোন খাদ্যবস্তুর (লালসা বোধক) অতি প্রশংসাও করিতেন না, আবার কুৎসাও করিতেন না। সত্যের বিরোধিতা দেখিলে সত্যকে সাহায্য করিয়া প্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত তাহার অপ্রতিহত ক্রোধ প্রশমিত হইত না। নিজস্ব ব্যাপারে তাঁহার ক্রোধ আসিত না এবং প্রতিশোধও লইতেন না। কাহারও প্রতি রাগান্বিত হইলে তাহার দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া নিতেন; সন্তুষ্টির দৃষ্টি অবনত করিতেন। তাঁহার হাসি মুচকি হাসি হইত এবং দাঁতসমূহ শিলার ন্যায় ঝকঝকে দেখাইত।

নবী (সঃ) গৃহে অবস্থানকালীন সময়কে তিন ভাগ করিতেন– একভাগ আল্লাহ তাআলার (এবাদত-বন্দেগীর) জন্য, এক ভাগ পরিবার-পরিজনের (অভাব-অভিযোগ কথাবার্তা ও প্রয়োজন মিটাইবার) জন্য; আর একভাগ নিজের (ব্যক্তিগত প্রয়োজন মিটাইবার) জন্য। নিজের জন্য সময়ের বেশী অংশ জনগণের (শিক্ষা ইত্যাদি) কাজে ব্যয় করিতেন; কিছু শিক্ষিতদের মাধ্যমে সকলকে উপকৃত করার ব্যবস্থা করিতেন, জনগণ হইতে কোন কিছু লুকাইয়া রাখিতেন না। জন সাধারণের জন্য নিজের সময় ব্যয় করিতেন, ধর্মীয় জ্ঞানে যোগ্য ব্যক্তিগণকে অগ্রগণ্য করিতেন এবং প্রত্যেককে তাহার প্রয়োজনের ভিত্তিতে সময় দিতেন। কাহারও একটি প্রয়োজন, কাহারও দুইটি, কাহারও আরও অধিক; সেই অনুপাতেই তাহাদের সহিত ব্যাপৃত হইতেন। তাহাদের হাল-অবস্থা জিজ্ঞাসা করিতেন, প্রয়োজনীয় বিষয়াবলী জ্ঞাত করিতেন, শিক্ষা দিতেন। আর লোকদিগকে অতিশয় তাকিদের সহিত বলিয়া দিতেন– উপস্থিতগণ অনুপস্থিতদিগকে পৌঁছাইয়া দিবে। আরও বলিতেন, কোন ব্যক্তি তাহার প্রয়োজনের সংবাদ আমার নিকট পৌঁছাইতে সক্ষম না হইলে তোমরা তাহা আমার নিকট পৌঁছাইয়া দিও। যেব্যক্তি শাসনকর্তার নিকট অক্ষম লোকের প্রয়োজনের সংবাদ পৌঁছাইয়া দিবে, আল্লাহ তাআলা তাহাকে পদস্থিতি দান করিবেন কেয়ামত দিবসে পুল-সেরাত চলার সময়। নবী (সঃ)-এর দরবারে একজনের মুখে অপর জনের ঐ শ্রেণীর বিষয়ই আলোচনা করা যাইত; কাহারও মুখে অপরের অন্য কোন আলোচনা হইত না।

লোকজন নবীজী (সঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হইত দ্বীনের অভাবী ও অন্বেষকরূপে, নবীজীর দরবারে তাহারা তৃপ্ত হইয়া বাহির হইত দ্বীনের অভিজ্ঞ ও দিশারীরূপে। মানুষের উপকারী কথা ছাড়া নবীজী স্বীয় জবান বন্ধ রাখিতেন। মানুষের মধ্যে সৌহার্দ্য সৃষ্টির জন্য চেষ্টা করিতেন, অনৈক্যের প্রতিরোধ করিতেন। গোত্রী প্রধানদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতেন এবং তাহার প্রাধান্য বজায় রাখিতেন। লোকদেরকে সদা সতর্ক রাখিতেন, নিজেও লোকদের হইতে সতর্ক থাকিতেন, অবশ্য সকলের সঙ্গে হাসি-মুখ ও সদ্ব্যবহার বজায় রাখিতেন। সহচরগণের খোঁজ-খবর লওয়ায় তৎপর থাকিতেন। লোকদের হাল– অবস্থা অবগতির জন্য

সচেতন থাকিতেন। ভালকে ভাল বলিয়া স্বীকৃতি দিতেন এবং তাহা প্রতিষ্ঠিত করিতেন। মন্দকে মন্দ বলিয়া প্রকাশ করিতেন এবং উচ্ছেদের চেষ্টা করিতেন। সর্ববিষয়ে তিনি মধ্যপন্থী ছিলেন; তাঁহার কার্যে বা কথায় অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হইত না। ভাল লোক তাঁহার অধিক নৈকট্য লাভ করিত; যে বেশী পরোপকারী হইত সেই তাঁহার নিকট বেশী ভাল গণ্য হইত। অন্যের সাহায্য ও বিপদ উদ্ধারে যে যত উত্তম হইত সে নবীজী (সঃ)-এর নিকট তত মর্যাদাবান পরিগণিত হইত।

মজলিসের মধ্যে তিনি প্রত্যেকের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন; এমনকি মজলিসের প্রত্যেক ব্যক্তি এই ভাবিত যে, তাহার অপেক্ষা অধিক আদরণীয় নবীজীর (সঃ) নিকট অন্য কেহ নহে। কেহ নবীজী (সঃ)-কে কোন কাজের জন্য বসাইলে বা দাঁড় করাইলে তিনি কষ্ট সহ্য করিয়াও তাহার সাথে অপেক্ষা করিতেন, এমনকি ঐ ব্যক্তিকেই তাঁহার হইতে বিদায় নিতে হইত। কেহ তাঁহার নিকট কোন সাহায্য চাহিলে হয় তাহার আশা পূর্ণ করিতেন, না হয় অতি মোলায়েম কথায় বিদায় দিতেন। নবীজী (সঃ)-এর উদারতা ও সদ্ব্যবহার সকলের জন্য প্রসারিত ছিল। এমনকি সকলে তাঁহাকে স্নেহশীল পিতা গণ্য করিত। সকলেই সমানভাবে তাঁহার হইতে উপকৃত হইত, তাক্ওয়া-পরহেজগারী অনুপাতে তাহাদের তারতম্য হইত।

তাঁহার মজলিসে জ্ঞান, বিদ্যা, সংযমশীলতা, ধৈর্য ও আমানতদারীর অনুশীলন হইত। সেই মজলিসে কথাবার্তা উচ্চৈঃস্বরে হইত না, কাহারও মান-সম্মানে আঘাত করা হইত না। তাকওয়া-পরহেজগারীর দরুন পরস্পর নম্র বিনয়ী হইত; বড়কে সম্মান করা হইত, ছোটকে স্নেহ করা হইত, অভাবীকে সাহায্য করা হইত, বিদেশীর প্রতি দয়া ও সহানুভূতি প্রদর্শন করা হইত।

নবীজী (সঃ) তিনটি স্বভাব হইতে মুক্ত ছিলেন– লোক দেখান স্বভাব, অপব্যয় এবং নিষ্প্রয়োজনীয় কাজে লিপ্ততা। আর তিনটি বস্তু হইতে মানুষকে রেহাই দিয়া রাখিয়াছিলেন– কাহারও গ্লানি করিতেন না, কাহারও প্রতি কটাক্ষ করিতেন না এবং কাহারও দোষ তালাশ করিয়া বেড়াইতেন না।

নবীজী (সঃ) স্বল্প খাওয়ায় ও শোয়ায় অভ্যস্ত ছিলেন। নবীজী (সঃ) নিদ্রাকালে শয্যায় ডান পার্শ্বের উপর শুইতেন। নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্ব হইতেই নবীজী (সঃ) প্রভাবময় মাহাত্ম্যের অধিকারী ছিলেন। ওকবা ইবনে আম্র (রাঃ) নবীজীর দরবারে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইতেই কাঁপিতে লাগিলেন। নবী (সঃ) বলিলেন, শান্ত থাক, আমি কোন পরাক্রমশালী বাদশা নহি। মদীনার দশ বৎসরের জীবনে নবীজী (সঃ) কত বিজয় লাভ করিয়াছিলেন, কত এলাকা জয় করিয়াছিলেন, রাজা-বাদশাহদের পর্যন্ত কত কত উপহার-উপঢৌকন লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু সবই জনসাধারণের জন্য ব্যয় করিয়া দিয়াছিলেন, এমনকি ইহজীবন ত্যাগকালে পরিবারের আহার জোটাইতে তাঁহার লৌহবর্ম বন্ধক রাখা ছিল। খাওয়ায়, পরায় ও বাসস্থানে নবীজী (সঃ) অত্যধিক সরল ও আড়ম্বরবিহীন ছিলেন।

তাঁহার প্রতি অন্যায় করা হইলে সেই অন্যায়ের প্রতিশোধ না লইয়া ক্ষমা করিতেন, অন্তরের প্রশস্ততায় অপরিসীম ছিলেন। সাহস ও বীরত্বে অতুলনীয় ছিলেন। শত্রুর মোকাবিলায় তাঁহার সঙ্গে একমাত্র বীরপুরুষ থাকিতে সক্ষম হইত। সীমাহীন দাতা ছিলেন। স্বভাব অত্যন্ত কোমল ও মধুর ছিল। অতি সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন; সময়ে নিজ হাতে ঘর ঝাড় দিতেন। নিজের এবং গৃহের কাজ নিজেই করিতেন, অতি গরীব রোগীকেও দেখিতে যাইতেন, গরীবদের সহিতও উঠা বসা করিতেন, নিজ খাদেম পরিচারকের সহিতও একত্রে বসিয়া খাইতেন। নিজ হাতে কাপড় তালি লাগাইতেন, বাজার হইতে নিজের বোঝা নিজেই বহন করিয়া আনিতেন। তিনি মানবকুলের জন্য সর্বাধিক উপকারী ও সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায়বিচারক ছিলেন। "ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম"

নবুয়তের প্রমাণ তথা হযরতের মোজেযার বয়ান (পৃঃ ৫০৪)

নবী এবং রসূলগণ হইতেন আল্লাহ তাআলার প্রতিনিধি। আল্লাহ তাআলা বান্দাগণকে তাঁহার পছন্দনীয়

পথে পরিচালিত করার জন্য বন্দাগণের নিকট স্বীয় প্রতিনিধিস্বরূপ নবী–রসূলগণকে প্রেরণ করিতেন। সুতরাং নবী রসূলগণের নিকট তাঁহাদের মনোনয়ন ও পদাধিকারের প্রমাণ থাকা আবশ্যক, যাহা তাঁহারা আল্লাহর বান্দাদের নিকট পরিচয়পত্ররূপে পেশ করিবেন এবং কেহ চ্যালেঞ্জ করিলে উক্ত প্রমাণ দ্বারাই সেই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করিবেন। এই জন্যই ইমাম বোখারী (রঃ) মো'জেযাসমূহের বর্ণনার পরিচ্ছেদটিকে "নবুয়তের প্রমাণসমূহের পরিচ্ছেদ" নামে ব্যক্ত করিয়াছেন– মো'জেযাকে নবুয়তের প্রমাণ নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন, এই আখ্যা বড়ই সামঞ্জস্যপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ। নবীগণের সেই প্রমাণ বা পরিচয়পত্রই হইল তাঁহাদের মো'জেযা। মো'জেযার অর্থ অসম্ভব কার্য নহে, বরং তাহার অর্থ মানুষের অসাধ্য কার্য। নবীগণের মো'জেযা মানুষের শক্তিসাধ্য বহির্ভূত হয় বটে এবং সেই সূত্রেই তাহা নবীর নবুয়তের প্রমাণ হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা কখনও আল্লাহ তাআলার শক্তি-ক্ষমতা বহির্ভূত হয় না; আল্লাহ ত সর্বশক্তিমান, অতএব তাহা কোন মতেই অসম্ভব বলা যাইতে পারে না। বরং আল্লাহ তাআলা তাঁহার প্রতিনিধির পক্ষে স্বীয় অসীম কুদরতের নিদর্শন স্বরূপই তাহা প্রকাশ করিয়া থাকিতেন। সুতরাং নবীদের মো'জেযাকে অসম্ভব সাব্যস্ত করতঃ তাহাকে অস্বীকার করা বস্তুত আল্লাহ তাআলার সর্বশক্তিমত্তাকে অস্বীকার করা। এতদ্ভিন্ন যেকোন দাবীর প্রমাণকে অস্বীকার করা প্রকৃত প্রস্তাবে সেই দাবীর সমর্থনে শিথিলতা প্রকাশেরই নামান্তর। অতএব মো'জেযা অস্বীকার করার অর্থ নবীর নবুয়তের প্রতি ঈমানের দুর্বলতা প্রকাশ করা।

প্রত্যেক নবীকেই আল্লাহ তাআলা এই পরিমাণ মো'জেযা প্রদান করিয়াছিলেন যাহা মানব জগতে তাঁহার নবুয়ত ও প্রতিনিধিত্ব প্রমাণের জন্য যথেষ্ট হয়। নিম্নে বর্ণিত হাদীছে এই বিষয়টি স্পষ্টরূপে উল্লেখ রহিয়াছে।

১৭৮৯। হাদীছ ঃ عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنَ الْاَنْبِيَاءِ مِنْ نَبِيٍّ اِلاَّ قَدْ اُعْطِىَ مِنَ الْاٰيَاتِ مَا مِثْلُهُ اٰمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَاِنَّمَا كَانَ الَّذِىْ اُوْتِيْتُ وَحْيًا اَوْحَى اِلَىَّ فَاَرْجُوْ اَنْ اَكُوْنَ اَكْثَرُهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ـ

অর্থ ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, নবীগণের প্রত্যেককেই আল্লাহ তাআলা এই পরিমাণ মো'জেযা দিয়াছিলেন, যাহা মানব সমাজের জন্য সেই নবীর প্রতি ঈমান আনার জন্য যথেষ্ট ছিল।

আমাকে (সর্বপ্রধান মো'জেযারূপে) যাহা প্রদান করা হইয়াছে তাহা ওহী পর্যায়ের; (কোরআন পাক– যাহা) আল্লাহ তাআলা ওহী মারফত আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন (এবং তাহা আমার দ্বীনের শাসনতন্ত্র বা আসমানী কিতাবরূপে এবং আমার মো'জেযারূপে আমার পরেও দীর্ঘস্থায়ী হইবে) ফলে কেয়ামতের দিন দেখা যাইবে যে, আমার অনুসারীদের জামাতই সংখ্যাগরিষ্ঠ।

ব্যাখ্যা ঃ নবুয়ত প্রাপ্তির পর রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের হস্তে স্বভাবতঃ বা কাফেরদিগকে চ্যালেঞ্জ করিয়া বা কাফেরদের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় বহু মো'জেযা বা অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছিল, যাহা তাঁহার সত্যতার অকাট্য প্রমাণ ছিল। নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে বরং ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বেও তাঁহার সম্পর্কে অনেক অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ পাইয়াছিল। এইসব ঘটনার সমষ্টি প্রায় তিন হাজার।

কাফেরদিগকে চ্যালেঞ্জ করিয়া যেসব মো'জেযা প্রকাশ পাইয়াছিল তাহার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মো'জেযা পবিত্র কোরআন। পবিত্র কোরআনের চ্যালেঞ্জ শুধু হযরতের যমানার কাফেরদের প্রতিই ছিল না, বরং কেয়ামত পর্যন্ত সমস্ত অমুসলিমদের প্রতিই এই চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান রহিয়াছে। পবিত্র কোরআন একাধিক জায়গায় স্বয়ং সেই চ্যালেঞ্জের ঘোষণা করিয়াছে যে, এই কোরআন স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক মুহাম্মদের (সঃ) উপর অবতারিত হওয়া সম্পর্কে যদি কোন ব্যক্তি বা দল সন্দেহ পোষণ করে এবং তাহারা মনে করে যে, ইহা মুহাম্মদের (সঃ) বা অন্য কোন মানুষের রচিত, তবে তাহারা এই কোরআনের বাক্যবিন্যাসের সমতুল্য তাহার

সর্বকনিষ্ঠ একটি সূরা পরিমাণ বাক্য তৈয়ার করিয়া বিশ্ববাসীর সম্মুখে উপস্থিত করুক; তবেই তাহাদের সন্দেহ বাস্তব বলা যাইতে পারিবে; অন্যথায় ঐরূপ সন্দেহ অসার সাব্যস্ত হইবে। কারণ, কোন মানুষ কর্তৃক রচিত এত বড় কলেবরের পুস্তকের শুধুমাত্র একটি লাইন পরিমাণ বাক্য তাহার সমতুল্য রচনা করা অন্য মানুষের সাধ্যে না হওয়া অস্বাভাবিক।

এই বিজ্ঞানের যুগের যেকোন আবিষ্কার সম্পর্কে কোন মানুষ এইরূপ দাবী টিকাইয়া রাখিতে পারে না যে, চিরকাল অন্য কোন মানুষ ইহার সমতুল্য আবিষ্কার করিতে পারিবে না। আজ পর্যন্ত বিশ্বে মানুয়ের আয়ত্তাধীন এমন কোন আবিষ্কৃত বস্তু দেখা যায় নাই, যাহা সর্বসাধারণ্যে প্রকাশিত ও প্রচারিত হওয়ার পরও তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী আবিষ্কারে সারা বিশ্ব অপারগ রহিয়াছে এবং দীর্ঘকাল অপারগ থাকিবে। অথচ এই কোরআন প্রথমতঃ চ্যালেঞ্জ প্রদান করিয়াছে–

اِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ـ

অর্থ ঃ "আমি আমার বিশেষ বান্দা (মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহর) উপর যে কিতাব নাযিল করিয়াছি (যাহা দ্বারা তিনি আমার রসূল ও প্রতিনিধি বলিয়া অকাট্যরূপে প্রমাণিত হইয়াছেন)। তাহা (আমার পক্ষ হইতে অবতারিত হওয়া) সম্পর্কে যদি তোমরা কোন প্রকার সন্দেহ পোষণ কর তবে তোমরা তাহার সমতুল্য একটি ছোট সূরা পরিমাণ বাক্য রচনা করিয়া আন।" অতপর আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন–

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِىْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ـ

অর্থ ঃ "যদি তোমরা তাহা করিতে না পার এবং কস্মিনকালেও পারিবে না, তবে তোমাদের অবশ্য কর্তব্য হইবে (ঐ সত্য প্রমাণিত রসূলকে স্বীকার করিয়া) দোযখ হইতে পরিত্রাণ লাভ করা। যাহার অগ্নি মানুষ ও পাথর দ্বারা প্রজ্বলিত হইবে।"

একাধিকবার এইরূপ চ্যালেঞ্জ প্রদানের পর কোরআন ভবিষ্যদ্বাণীও করিয়াছে–

لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْاِنْسُ عَلٰى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا ـ

অর্থ ঃ "বিশ্বের সমস্ত মানব-দানব একত্রে পরস্পর সহায়ক হইয়াও যদি এই প্রচেষ্টা চালায় যে, কোরআনের সমতুল্য বাক্য রচনা করিয়া আনিবে, তবুও তাহারা কস্মিনকালেও সেই প্রচেষ্টায় সাফল্য লাভে সক্ষম হইবে না।" (পারা–১৫, রুকু–১০)

পবিত্র কোরআন নাযিল হওয়ার যুগে কোরআনের ঘোর শত্রু আরবের পৌত্তলিকগণ, ইহুদী এবং নাসারাগণ আরবি ভাষায় আরবি কাব্যে যে অতিশয় দক্ষ ও পারদর্শী ছিল তাহা ইতিহাস প্রসিদ্ধ। এতদসত্ত্বেও সেই শত্রুগণ রসূলুল্লাহর (সঃ) বিরুদ্ধে, কোরআনের বিরুদ্ধে হাজার হাজার প্রাণ বিসর্জন দিয়া যুদ্ধ করিয়াছে, কোরআনকে বানচাল করার জন্য শত শত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে; কিন্তু এই সহজ পন্থায় তাহারা আসে নাই যে, মাত্র এক লাইন পরিমাণ একটি ছোট সূরার সমতুল্য বাক্য রচনা করিয়া নিয়া আসে। বস্তুতঃ ইহা যে তাহাদের জন্য মোটেই সম্ভব নহে তাহা তাহারা ভালরূপেই উপলব্ধি করিতেছিল।

আজও মধ্যপ্রাচ্যে আরবী ভাষাভাষী খৃস্টান ইহুদী অমুসলিম কোরআনের শত্রু বিদ্যমান রহিয়াছে ইউরোপ আমেরিকায় আরবী ভাষায় অনেক অনেক সুপণ্ডিত হইয়াছে এবং আছে, না থাকিলে হওয়ার জন্য আরবি ভাষার দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে সকল প্রকার বিবাদ ছাড়িয়া দিয়া মুসলমানদের কোরআনকে বানচাল করতঃ তাহাদের জাতীয় বুনিয়াদ ধ্বংস করিতে এই পথ তাহারা অবলম্বন করিতে পারে, কিন্তু মহান কোরআনের এত বড় প্রভাব যে, তাহার চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় দাঁড়াইবার সাহস কাহারও

নাই, কেয়ামত পর্যন্ত হইবেও না।

আজও আরবের অমুসলিম সাহিত্যিকগণ স্বীকার করিয়া থাকে– "কোরআনকে মানব রচিত গ্রন্থ বলা স্বীয় সাহিত্যিকতা ও পাণ্ডিত্যের উপর কালিমা লেপন স্বরূপ।"*

পূর্ববর্তী নবীগণকে যত মো'জেযাই প্রদান করা হইয়াছিল, প্রত্যেক নবীর দুনিয়া ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মো'জেযাও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কোন নবীর মো'জেযা বর্তমান বিশ্বে বিদ্যমান আছে বলিয়া কেহ কোন নিদর্শন দেখাইতে পারিবে না। একমাত্র মুসলমানদের কোরআন এবং তাঁহাদের নবী মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বর্ণনা ব্যতীত পূর্ববর্তী নবীগণ সম্পর্কে কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ বর্তমান বিশ্বে মোটেই নাই।

কিন্তু মুসলিম জাতির পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নবুয়ত তদ্রূপ নহে। তাঁহার প্রধানতম মো'জেযা পবিত্র কোরআন অবিকলরূপে তাহার বিঘোষিত চ্যালেঞ্জ সহ আজও বিশ্ব বুকে বিদ্যমান রহিয়াছে এবং দুনিয়ার আয়ুষ্কাল পর্যন্ত থাকিবে। যখন যাহার ইচ্ছা তাহার চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করিয়া দেখিতে পারে যে, বাস্তবিকই ইহা মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নবুয়তের সঠিক প্রমাণই বটে।

হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) যেহেতু সর্বশেষ নবী এবং তাঁহার দ্বীনই সর্বশেষ দ্বীন, তাই তাঁহার জন্য এইরূপ দীর্ঘায়ু-বিশিষ্ট মো'জেযার আবশ্যকও ছিল। তাঁহার এই মো'জেযার প্রভাবে যুগে যুগে বহু লোক তাঁহার দ্বীনে দীক্ষিত হইয়া আসিতেছে। এই বিষয়টির প্রতিই উল্লিখিত হাদীছে ইঙ্গিত রহিয়াছে।

পবিত্র কোরআন রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মো'জেযা ছিল বিরুদ্ধবাদীগণকে চ্যালেঞ্জ

---

* পবিত্র কোরআন হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সত্যতার মো'জেযা বা প্রমাণ। কারণ এই কোরআন কোন মানুষের রচনা হওয়া অসম্ভব, ইহা নিশ্চয় আল্লাহর বাণী! আল্লাহর অকাট্য বাণীর বাহক যিনি তিনি অবশ্যই আল্লাহর নবী বা রসূল।

পবিত্র কোরআন যে মানুষের রচনা হইতে পারে না তাহার প্রমাণ পবিত্র কোরআনের নিজস্ব রূপ ও আকার-আকৃতি। এই সত্যকেই কোরআন তাহার চ্যালেঞ্জ দ্বারা প্রমাণিত করিয়াছে। এবং কোরআনের রূপে ও আকৃতিতে ঐ সত্য সদা স্বতঃ উদ্ভাসিত। যেমন, তাহার বৈজ্ঞানিক আলোচনা করিয়াছেন একজন ফরাসী খৃষ্টান বৈজ্ঞানিক মরিস বুকাইলী তাঁহার "দি বাইবেল, দি কোরআন এণ্ড সায়েন্স" পুস্তকে। উক্ত আলোচনার কতিপয় অংশ প্রকাশিত হইয়াছে ১৯৮২ সালের ডিসেম্বর ২৮ তারিখে দৈনিক ইত্তেফাকের উপ-সম্পাদকীয়তে। নিম্নে তাঁহার ভাষায় উদ্ধৃতি দেওয়া হইল–

বিজ্ঞানী বুকাইলী বলেছেন– কোরআনকে আমি নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীতেই বিচার করেছি। প্রথমে অনুবাদের সাহায্য নিয়েছি, তারপর আমি আরবি শিখেছি এবং বিজ্ঞানের সত্য আর কোরআনে বর্ণিত বক্তব্য পাশাপাশি রেখে একটা তালিকা প্রস্তুত করেছি এবং সংগৃহীত যাবতীয় প্রমাণ-দলীলের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, কোরআনে এমন একটা বক্তব্যও নাই, যা আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে অসত্য বা ভ্রান্তিপূর্ণ।

মরিস বুকাইলী বলেছেন– আমার প্রথম উদ্দেশ্য ছিল, কোরআনের প্রতিটি বাক্য বিচার বিশ্লেষণ করা এবং সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গিতে কোরআনের অসারতা প্রমাণ করা। কিন্তু যখনই কোরআন পড়া শুরু করলাম, দেখতে পেলাম– বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনা ও বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন বিষয় কী সঠিকভাবেই না কোরআনে তুলে ধরা হয়েছে। একটা বিষয় আমার কাছে সবচাইতে অদ্ভুত বলে মনে হচ্ছিল ঃ আজকের যুগে যেসব বৈজ্ঞানিক সত্য আমরা এত চিন্তা, গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করে পাচ্ছি, হযরত মুহাম্মদের (সঃ) যুগে বসে কি করে সেসব বিষয় একজন মানুষ জানতে পারল? সে যুগে এ বিষয়ে মানুষের তো কোন ধারণাই থাকার কথা নয়।

বিজ্ঞানী বুকাইলী তাঁর ঐ পুস্তকে আরও বলেছেন–

বিশ্ব সৃষ্টির রহস্য, জ্যোর্তিবিজ্ঞানের নানা তথ্য, পৃথিবী জীব-জন্তু, গাছ-পালা সৃষ্টির এবং মানুষের জন্মের নানা প্রক্রিয়া সম্পর্কে কোরআনে এত প্রচুর বক্তব্য রয়েছে যে, সন্ধানী পাঠক মাত্রই বিস্মিত না হয়ে পরে না। অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে এইসব বিষয় সংক্রান্ত বক্তব্যের প্রায় সবগুলিই যেখানে মিথ্যা কিম্বা ভ্রান্তিপূর্ণ, সেখানে ১৪ শত বছর আগেকার কোরআনের এতদসংক্রান্ত তথ্য ও বক্তব্য এতটা সঠিক হয় কিভাবে?

ফরাসী বিজ্ঞানী বুকাইলী সত্য প্রকাশে বাধ্য হয়ে বলেছেন–***I had to stop and ask myself :*** *If a man was the author of the Quran, how could he have written faets in the Seventh Century A.D. that today are shown to the in keeping with modern Scientific Knowledge?*

এই গ্রন্থ পাঠ করতে করতে আমি থমকে যাই এবং আমার নিজেকে প্রশ্ন করি, কোরআনের গ্রন্থকার যদি একজন মানুষই হতেন তবে তাঁর পক্ষে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে এমন বৈজ্ঞানিক সত্যসমূহের উপর আলোকপাত করা কিভাবে সম্ভব হল– যা

করিয়া। এতদ্ভিন্ন কোন কোন মো'জেযা বিরুদ্ধবাদীগণের চ্যালেঞ্জের উত্তরেও প্রকাশ পাইয়াছিল, যেমন "শাক্কুল কামার"– চাঁদ দিখণ্ডিত করার মো'জেযা।

হযরত (সঃ) কর্তৃক চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করার মো'জেযা (পৃঃ ৫১৩–৫৪৬)

অন্ধকার যুগেও কাফেরগণ মনগড়ারূপে হজ্জ পালন করিয়া থাকিত। হজ্জের কার্যাবলী পালনান্তে যিলহজ্জ চাঁদের ১১, ১২, ১৩ তারিখ মিনায় অবস্থান করিয়া আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকার নিয়ম রহিয়াছে। সেকালেও এই দিনগুলি মিনায় কাটাইবার নিয়ম ছিল। অবশ্য কাফেরগণ তথায় নিজেদের বাহাদুরী এবং নিজ নিজ পূর্বপুরুষদের প্রাধান্যের আলোচনা সম্বলিত কবিতার ছড়াছড়ি করিয়া কাটাইত; এই সূত্রে উক্ত তারিখে মিনার মধ্যে একত্রে অনেক লোক পাইয়া যাওয়ার এক সুযোগ লাভ হইত।

হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) এই সুবর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহারের উদ্দেশে হয়ত তথায় পৌঁছিয়াছিলেন। আবু জাহলসহ কতিপয় কাফের সর্দার তখন হযরত (সঃ)-কে আল্লাহর রসূল হওয়ার দাবীর প্রমাণস্বরূপ কোন অলৌকিক ঘটনা কিম্বা নির্দিষ্টরূপে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করিয়া দেখাইবার চ্যালেঞ্জ করিল।

হযরত (সঃ) সর্বদা মক্কার সর্দারগণকে কোন উপায়ে ইসলামের ছায়াতলে টানিয়া আনার সুযোগের সন্ধানে থাকিতেন। সুতরাং তিনি তাহাদের এই চ্যালেঞ্জ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তাআলার দরবারে দোয়া

আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যশীল বলে বর্তমান যুগে দাবী করা হয়?

এই আলোচনাকে আরও সুস্পষ্ট করতে বুকাইলী বলেছেনঃ মুহাম্মদের (সঃ) উপর কোরআন অবতীর্ণ হওয়র সময়টিতে ফ্রান্সে রাজত্ব করতেন রাজা জাগোবার্ড (৬২৯–৬৩৯)। কোন মানুষই যদি এই কোরআনের রচয়িতা হয়ে থাকেন, তাহলে তাঁর পক্ষে কিভাবে এত সব বিষয়ের সঠিক ও বৈজ্ঞানিক তথ্য ও সত্য তুলে ধরা সম্ভব হল যা আমরা আজ এত শত বছর পর জানতে পেরেছি?

অমুসলিম বিশ্বের এই ধারণা যে, কোরআনে এই সব বিস্ময়কর বিষয় পরবর্তীকালে সংযোজিত হয়েছে– খৃস্টান মরিস বুকাইলী এই ধারণার খণ্ডনে বলেছেনঃ তিনি এর সত্যতা খুঁজতে গিয়ে নিজে (রাশিয়ার অন্তর্গত) তাশকন্দ সফর করেছেন এবং সেখানকার জাদুঘরে সংরক্ষিত হযরত ওসমান (রাঃ)-এর আমলের কোরআনের সাথে বর্তমান আমলের কোরআনের প্রতিটি আয়াত ধরে ধরে মিলিয়ে নিয়েছেন। দেখেছেন, এই তের শত বছর পরেও কোরআনে কোন একটি শব্দও অনুপ্রবেশ করে নাই।

বিজ্ঞানী বুকাইলী ইতিহাসের প্রমাণপঞ্জী তুলে ধরে বলেছেন ঃ মুহাম্মদ (সঃ) যিনি ছিলেন নিরক্ষর, সেই নিরক্ষর লোকটির দ্বারা এই সময়কার আরবে কোন একটি সর্বোৎকৃষ্ট সাহিত্যকর্ম কিভাবে রচিত হতে পারে? শুধু কি তাই? সেই নিরক্ষর লোকটির পক্ষে কিভাবেই বা সম্ভব বিজ্ঞানের প্রাকৃতিক রহস্যাবলীর এমন সব সত্য নির্ভুল তথ্য তুলে ধরা, যা সে সময়ের যেকোন লোকের চিন্তারও অগোচরে থাকার কথা এবং সেই দুরূহ বিষয় সংক্রান্ত তথ্য ও সত্যের বর্ণনায় কোথাও একবিন্দু ত্রুটি কিম্বা বিচ্যুতি খুঁজে পাওয়া অসম্ভব।

মরিস বুকাইলী তাঁর পুস্তকে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন– নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক বিচার বিশ্লেষণ ও গবেষণার শেষ সিদ্ধান্ত হচ্ছে একটাই। আর তা হলো, সপ্তম শতাব্দীর কোন মানুষের পক্ষেই শত শত বৎসর পরে আবিষ্কৃত বিজ্ঞানের এত সব প্রতিষ্ঠিত বিষয় ও সত্য এবং বিচিত্র জ্ঞান ও তথ্য বুঝতে পারা ও প্রকাশ করা আদৌ সম্ভব নয়। কোরআন যে কোন মানুষের রচনা নয়, আমার কাছে এটাই তার সবচাইতে বড় প্রমাণ। (সমাপ্ত)

পাঠকবৃন্দ! ফরাসী খৃস্টান বিজ্ঞানী বুকাইলী তাঁহার সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক কঠিন প্রাচীর ভেদ করিয়া শেষ পর্যন্ত ইসলামের ছায়াতলে আসিয়াছিলেন কি-না তাহা জানা নাই। কিন্তু তিনি বর্তমান উন্নত দেশের একজন বিজ্ঞানী, পবিত্র কোরআনকে যাচাই-বাছাই করার জন্য তিনি নজিরবিহীন সুদীর্ঘ ও কঠিন সাধনা করিয়াছেন। তারপর সমালোচনার উদ্দেশ্যে তাহার চুল-চেরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং বৈজ্ঞানিক বিচার বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এমনকি তিনি তাঁহার ঐসবসাধনা, গবেষণা ও অভিজ্ঞতার উপর গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন এবং তখনও তিনি অমুসলম। তিনি তাঁহার সেই গ্রন্থে সুচিন্তিত অভিমত ও স্থির সিদ্ধান্ত সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন যে, "কোরআন মানুষের রচনা নহে।" কোন মুসলমানের এইরূপ উক্তি অপেক্ষা বিজ্ঞানী খৃষ্টান বুকাইলীর উক্তি অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

তাঁহার এই সিদ্ধান্ত সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক জর্জ "বার্নার্ডশ"-এর একটি মূল্যবান দর্শন স্মরণ করাইয়া দেয়– "সত্য স্বতই প্রকাশমান। যিনি চক্ষুষ্মান তিনি সে সম্পর্কে কোন দ্বিধা বা সন্দেহে ভোগেন না। যে অন্ধ সে সত্য দেখার জন্য জেদ ধরে বটে, কিন্তু চোখ না থাকার কারণে দেদীপ্যমান সত্য দেখা তার পক্ষে আদৌ সম্ভব হয় না।"

করিলেন। অতপর স্বীয় শাহাদত অঙ্গুলি দ্বারা * চাঁদের প্রতি ইশারা করিলেন, ফলে তৎক্ষণাত পূর্ণ চাঁদ দুই খণ্ড হইয়া গেল। এমনকি এক খণ্ড হইতে অপর খণ্ড অনেক দূর ব্যবধানে চলিয়া গেল। হযরত (সঃ) কাফেরদিগকে বলিলেন, اشهدوا তোমরা ভালরূপে প্রত্যক্ষ কর, ভালরূপে দেখিয়া নাও।

তালাবদ্ধ অন্তরবিশিষ্ট কাফেরগুষ্ঠি সবকিছু দেখা ও উপলব্ধি করা সত্ত্বেও তাহাকে জাদু বলিয়া উড়াইয়া দিল। এমনকি তাহাদের কেহ কেহ এইরূপ উক্তি করিল যে, মুহাম্মদ (সঃ) আমাদের দৃষ্টির উপর জাদু করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকিবে। অতএব, দূর-দেশ হইতে আগন্তুক মুসাফিরদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া দেখা হউক যে, তাহারা এস্থান হইতে দূরে থাকাবস্থায় চাঁদ দিখণ্ড হওয়া দেখিয়াছে কি-না? খোঁজ করিয়া তাহারা এইরূপ লোকও পাইল যাহারা দূর-দেশে থাকাবস্থায় এই তারিখে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়া * দেখিয়াছে। এতদসত্ত্বেও তাহারা তাহাকে সর্বগ্রাসী জাদু বলিয়া আখ্যায়িত করিল এবং ঈমান আনিল না।

সীরাত শাস্ত্র তথা নবুয়তের ইতিহাস বর্ণনা শাস্ত্রে ত চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করার মো'জেযা সম্পর্কে ভূরি ভূরি প্রমাণ বর্ণিত রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন কোরআন-হাদীছের অকাট্য প্রমাণ দ্বারাও তাহা প্রমাণিত রহিয়াছে। পবিত্র কোরআনের ঘোষণা–

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ۔ وَاِنْ يَّرَوْا اٰيَةً يُّعْرِضُوْا وَيَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌ ۔

অর্থ ঃ (বিশ্ববাসী! সতর্ক হও;) কেয়ামত ঘনাইয়া আসিয়াছে; (যাহার সংবাদদাতার সত্যতা প্রমাণে) চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে * কিন্তু কাফেরদের অবস্থা এই যে,

তাহারা (রসূলুল্লাহর সত্যতার) কোন প্রমাণ দেখিলে তাহা উপেক্ষা করে এবং বলে, ইহা বড় শক্তিশালী জাদু। (সূরা কামার– পারা–২৭)

এই সম্পর্কে হাদীছও অনেক আছে। ইমাম বোখারী (রঃ) দুই স্থানে এই বিষয়ে দুইটি পরিচ্ছেদ উল্লেখ করিয়াছেন। ৫১৩ পৃষ্ঠায় "মোশরেকগণ (সত্যতার) প্রমাণ দেখিতে চাহিলে নবী (সঃ) তাহাদিগকে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার মো'জেযা দেখাইয়াছিলেন।" ৫৪৬ পৃষ্ঠায় "চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার বয়ান" এই পরিচ্ছেদদ্বয়ে নিম্নে বর্ণিত হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

১৭৯০। হাদীছ ঃ عن انس ابن مالك رضى الله تعالى عنه انَّ اَهْلَ مَكَّةَ سَاَلُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُّرِيَهُمْ اٰيَةً فَاَرَاهُمُ الْقَمَرَ شِقَّتَيْنِ حَتّٰى رَاَوْا حِرَاءَ بَيْنَهُمَا

অর্থ ঃ আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, মক্কাবাসী কাফেররা রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে ফরামায়েশ করিল, তিনি যেন তাহাদিগকে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করিয়া দেখান। তিনি তাহা দেখাইলেন, এমনকি চাঁদের খণ্ডদ্বয় পরস্পর এ রূপ ব্যবধানে চলিয়া গেল যে, তাহাদের মধ্যস্থলে দর্শকগণ হেরা পর্বত দেখিতে পাইল।

---

*তফসীর রহুল মাআনী– সূরা কমার।

* সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মোহাদ্দেস "ইমাম বায়হাকী" তাঁহার "দালায়েলুন নবুয়াহ্– নবীর সত্যতার প্রমাণ" নামক কিতাবে ঘটনা প্রত্যক্ষকারী ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) হইতে এই সম্পর্কে একটি সুদীর্ঘ বিবৃতি বর্ণনা করিয়াছেন– যাহার উল্লেখ সম্মুখে আসিতেছে।

* انشق শব্দটি মাজি তথা অতীতকাল বোধক ক্রিয়াপদ; যাহার অর্থ খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে ভবিষ্যৎকালের অর্থ টানিয়া আনা যে, (কেয়ামত বা মহাপ্রলয়কালে) খণ্ডিত হইবে– ইহা উক্ত শব্দের মূল অর্থের বিপরীত। এইরূপ ব্যবহার রূপক বা উপঅর্থে স্থান বিশেষে অনুমোদিত)।

কিন্তু এস্থলে প্রয়োজন না থাকায় তাহা অশুদ্ধ হইবে। এতদ্ভিন্ন এস্থলে ভবিষ্যত কালের অর্থ লওয়া হইলে সংলগ্ন পরবর্তী আয়াতের সঙ্গতি বিনষ্ট হইবে। পরবর্তী আয়াতের মর্মে বুঝা যায়, কাফেরগণ হযরতের সত্যতার এই প্রমাণ দেখিয়াছে এবং ইহা শক্তিশালী জাদু বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছে। ছাহাবী ইবনে আব্বাস (রাঃ)ও উক্ত আয়াত আলোচ্য মো'জেযা সম্পর্কে সাব্যস্ত করিয়াছেন। (১৭৯২ হাদীছ দ্রষ্টব্য)

১৭৯১। হাদীছ ঃ عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال انْشَقَّ الْقَمَرُ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى فَقَالَ اشْهَدُوْا وَذَهَبَتْ فِرْقَةٌ نَحْوَ الْجَبَلِ ـ

অর্থ ঃ ইবনে মসউ'দ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা মিনায় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম।* (হযরতের আঙ্গুলের ইশারায়) চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল। হযরত (সঃ) উপস্থিত সকলকে বলিলেন, (আমার রসূল হওয়ার প্রমাণ) প্রত্যক্ষ কর। এক খণ্ড অপর খণ্ড হইতে দূরে হেরা পর্বতের দিকে চলিয়া গিয়াছিল।

১৭৯২। হাদীছ ঃ عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنه انَّ الْقَمَرَ انْشَقَّ فِيْ زَمَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

অর্থ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নিশ্চয় ইহা একটি সত্য ঘটনা যে, হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের যমানায় (তাঁহারই সত্যতার প্রমাণস্বরূপ) চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হইয়াছিল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ "শাক্কে কামার" বা চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করার মো'জেযা সম্পর্কে ইমাম বোখারী (রঃ) তিন জন সুপ্রসিদ্ধ ছাহাবীর বর্ণিত হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) ছাহাবীর বর্ণনায় স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, তিনি ঐ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। আনাছ (রাঃ) ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) ছাহাবীদ্বয়ের বর্ণনায় প্রমাণিত হয়, ঐ ঘটনা সেকালের স্থানীয় লোকদের মধ্যে এতই প্রসিদ্ধ ছিল যে, উপস্থিত অনুপস্থিত সকলের নিকটই তাহা বাস্তবরূপে স্বীকৃত ছিল। আনাছ (রাঃ) তথায় উপস্থিত ছিলেন না, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) ঘটনার সময় পয়দাও হন নাই, কিন্তু তাঁহারা জনসাধারণের স্বীকৃতি সূত্রেই ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন।

এতদ্ভিন্ন হোযায়ফা (রাঃ), জোবায়ের ইবনে মোতয়ে'ম (রাঃ), ইবনে ওমর (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবী হইতেও এই ঘটনা বর্ণিত হাদীছ বিদ্যমান রহিয়াছে।

"শাক্কুল কামার" বা চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করার মো'জেযা মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সত্যতার এবং রসূল হওয়ার একটি অতি উজ্জ্বল প্রমাণ ছিল। এই মো'জেযা হযরতের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য, অন্য কোন নবীকে চাঁদের উপর এইরূপ প্রতিক্রিয়া দেখাইবার মো'জেযা প্রদান করা হয় নাই।

(যোরকানী, ৫-১০৭)

"চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার" মো'জেযার প্রমাণ

পুরাতন যুগের ঘটনাবলীর সংবাদ সম্পর্কে ইতিহাস শাস্ত্র অপেক্ষা হাদীছ শাস্ত্রের মান-মর্যাদা ও

* হযরত (সঃ) মিনায় থাকিয়াই চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করার মো'জেযা দেখাইয়াছিলেন। কোন কোন বর্ণনায় মক্কার নাম উল্লেখ আছে, তাহা বাস্তবের বিপরীত নহে, কারণ মক্কাই হইল কেন্দ্রীয় নগরী।

মিনা তাহারই সংলগ্ন- শহরতলী স্বরূপ। তদুপরি মক্কার নাম উল্লেখের উদ্দেশ্য এই যে, হযরত (সঃ) মক্কায় থাকাকালীন এই মো'জেযা সংঘটিত হইয়াছিল।

চাঁদের খণ্ডদ্বয়ের মধ্যস্থলে হেরা পর্বত দেখা যাওয়ার এবং মিনা এলাকায় ঘটনা সংঘটিত হওয়ার উল্লেখ বিশেষ সঙ্গতিপূর্ণ। কারণ হেরা পর্বত মিনা এলাকায়ই অবস্থিত। কোন কোন বর্ণনায় চাঁদের খণ্ডদ্বয়ের অবস্থান নির্ণয়ে "আবু কোবায়েস পাহাড়" "সোআয়দা পাহাড়", "সাফা পাহাড়, "মারওয়া পাহাড়" ইত্যাদি নাম উল্লেখ হইয়াছে; এই পাহাড়সমূহ খাস মক্কা নগরীর মধ্যে অবস্থিত। এই সব বর্ণনা মূল ঘটনার সহিত সঙ্গতিবিহীনও নহে এবং পরস্পর বিরোধীও নহে, কারণ হেরা পর্বত এবং উল্লিখিত অন্যান্য পর্বতগুলি সবই ২/৩ মাইল সীমার মধ্যে অবস্থিত। চাঁদের ন্যায় এত ঊর্ধ্বের একটি বস্তু তথায় দণ্ডায়মান ব্যক্তিদের সম্মুখে উল্লিখিত সবগুলি পাহাড়ের উপর দেখা যাওয়া এবং এক বর্ণনাকারীর এক একটি উল্লেখ করা বা একই বর্ণনাকারীর বিভিন্ন বর্ণনায় বিভিন্ন নাম উল্লেখ করা মোটেই সঙ্গতিবিহীন নহে। অধিকন্তু হেরা পর্বতের নাম উল্লেখের বর্ণনায় পর্বতটি চাঁদের খণ্ডদ্বয়ের মধ্যস্থলে দৃষ্ট হওয়ার বয়ান রহিয়াছে, পক্ষান্তরে অন্যান্য পর্বতের নাম উল্লেখের বর্ণনায় চাঁদের এক-একটি যে যে পাহাড় বরাবর দেখা যাইতেছিল তাহার বয়ান রহিয়াছে।

নির্ভরযোগ্যতা অনেক অনেক বেশী, এমনকি উভয়ের কোন তুলনাই হইতে পারে না। কারণ, হাদীছ শাস্ত্রের প্রাণবস্তু হইতেছে প্রত্যেকটি বিষয়বস্তুর জন্য সনদ বা পরম্পরা সাক্ষ্য সূত্র উল্লেখ করা; তাহাও আবার মোহাদ্দেসগণের চুলচেরা বাছনিতে, যেন বিশ্বস্ততার প্রতি উচ্চস্তরে পৌঁছিয়া যায়। বিশেষতঃ ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিমের বাছনির মর্যাদা ত অনেক উর্ধ্বে। পক্ষান্তরে ইতিহাস শাস্ত্রে অতীতের ঘটনাবলীর ছড়াছড়ি ত খুবই আছে, কিন্তু হাদীছ শাস্ত্রের ন্যায় সাক্ষী পেশ করার রীতি সেখানে নাই, বাছনি করার কোন বাধ্যবাধকতা বা বিধান ত মোটেই নাই; অথচ হাদীছের সনদ বা সাক্ষীসমূহ তিলে তিলে বাছিয়া নিবার জন্য "উসূলে হাদীছ" নামে বিশেষ শাস্ত্র এবং তাহার ধারাগুলি প্রয়োগের জন্য "আসমাউর রেজাল" নামে আর একটি বিশেষ শাস্ত্র বিরাট বিরাট গ্রন্থাবলী আকারে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। (১ম খণ্ডের দ্রষ্টব্য)।

সুতরাং কোন সংবাদ হাদীছের দ্বারা প্রমাণিত হইলে সেখানে ইহা ইতিহাসে উল্লেখ নাই এইরূপ অজুহাত পেশ করা জঘন্য ধরনের অন্যায় হইবে।

আলোচ্য মো'জেযার ঘটনা বোখারী ও মুসলিম শরীফসহ সমুদয় হাদীছ গ্রন্থে প্রত্যক্ষ দর্শকের সাক্ষ্য ও বিবৃতির মাধ্যমে বর্ণিত রহিয়াছে। তদুপরি মুসলমান ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থাবলীতে বিশেষতঃ সীরাত তথা নবুয়তের ইতিহাস শাস্ত্রের প্রত্যেক গ্রন্থে উল্লেখ রহিয়াছে। এতদসত্ত্বেও ইসলাম বিদ্বেষীগণ আমাদের নবীর এই মহান মো'জেযা এই বলিয়া উপেক্ষা করিতে চায় যে, ইতিহাসে ইহার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না– ইহা জঘন্য ধৃষ্টতা। তাহাদিগকে ইহাও বুঝিতে হইবে, সেই আমলে আরবের ন্যায় শিক্ষা-দীক্ষাহীন দেশে ইতিহাস সংগ্রহের স্বপ্ন কেহ দেখে নাই এবং সংবাদপত্র বা অন্য কোন যোগাযোগ ব্যবস্থায় বহির্বিশ্বের যোগসূত্র সেখানে মোটেই ছিল না।

তাহারা আরও বলেন, চন্দ্র এমন বস্তু যে তাহা বিশ্বের প্রত্যেক স্থান হইতে দেখা যায়। অতএব চন্দ্রের উপর এরূপ পরিবর্তন আসিয়া থাকিলে বিশ্ববাসী তাহা অবশ্যই বিশেষ কৌতুকের সহিত গ্রহণ করিত এবং ইতিহাসে বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিত।

এ প্রশ্নের দ্বারা কোন জ্ঞানশূন্য বোকাকে ধোকা দেওয়া ত সম্ভব, কিন্তু বাস্তবের সম্মুখে ইহা মাকড়সার জালস্বরূপ। চিন্তা করুন– (১) চন্দ্র-সূর্যের উদয় অস্ত বিশ্বের সকল দেশে এক সঙ্গে হয় না। এক দেশে যখন রাত্র, অপর দেশে তখন দিন; সুতরাং যেই সময় মক্কায় চন্দ্র খণ্ডিত হয় তখন বিশ্বের অনেক দেশে দিন ছিল; চন্দ্র দৃষ্ট ছিল না। যেরূপ এখনও চন্দ্র-সূর্যের গ্রহণ এক দেশে দৃষ্ট হয়; কিন্তু অনেক অনেক দেশে তাহা দৃষ্ট হয় না; সংবাদপত্র মারফত এইরূপ শুনা যায়। (২) উদয় অস্তের বিভিন্নতার দরুন বিভিন্ন দেশে সময়ের বিভিন্নতা অপরিহার্য। সুতরাং মক্কা নগরীতে যখন এই ঘটনা ঘটিয়াছিল তখন অনেক দেশে এমন গভীর রাত্র ছিল যে, তখন সেস্থানের লোকগণ নিদ্রামগ্ন ছিল। (৩) স্বাভাবিক আবর্তন বিবর্তনের দরুন ঊর্ধ্ব জগতে যেসব সাধারণ ঘটনা ঘটিয়া থাকে, যেমন চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণ যাহা হিসাবের দ্বারা পূর্ব হইতে নির্ধারিত ও প্রচারিত থাকে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখার লোকের সংখ্যাও কতই না নগণ্য; আর আলোচ্য মো'জেযাটি ত একটি আকস্মিক ও অস্বাভাবিক ঘটনা ছিল– যাহার কোনই পূর্বাভাস ছিল না। সুতরাং ঘটনাস্থলে উপস্থিত লোকগণ ত অবশ্যই তাহা অবলোকন করিয়াছে, কিন্তু সাধারণ বিশ্ববাসী বহু সংখ্যায় তাহার প্রতি তাকাইবে এরূপ আশা করা নিতান্তই অবান্তর। (৪) ঘটনাটি রাত্রি বেলার, তাহাও সাময়িক এবং অল্প সময়ের; ঠিক ঐ সময়ে আকাশের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধকারীর সংখ্যা কত হইতে পারে তাহ বুঝা কঠিন নহে।

এইসব বিষয়ের প্রতি বাস্তব দৃষ্টি রাখিয়া প্রশ্নটি বিবেচনা করিলে বুঝা যাইবে, যেভাবে ইহাকে বিশ্বজোড়া রূপ দেওয়া হইয়াছে তাহা শুধু একটা ধোকার জাল মাত্র।

মক্কার পার্শ্ববর্তী দেশ-বিদেশে এই ঘটনা পরিলক্ষিত হয় নাই তাহাও নহে। মক্কার সর্দারগণ এই সম্পর্কে খোঁজ-খবর লইয়া ঘটনার বাস্তবতারই সাক্ষ্য প্রমাণ পাইয়াছে। ইমাম বায়হাকী ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ইবনে মসউ'দ (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন–

انشق القمر بمكة فقالوا سحركم ابن ابى كبشة فاسئلوا السفار فان كانوا راوا ما رايتم فقد صدق فانه لايستطيع ان يسحر الناس كلهم وان لم يكونوا راوا ما رايتم فهو سحر فاسئلوا السفار وقد قدموا من كل وجه فقالوا رايناه الكفار هذا سحر مستمر -

অর্থাৎ চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার মোযেজা মক্কায় প্রদর্শিত হইল, তখন মক্কাবাসী কাফেররা তাহা জাদু বলিয়া সাব্যস্ত করিল এবং পরস্পর বলিল, বিদেশ ভ্রমণ হইতে আগন্তুকদিগকে জিজ্ঞাসা কর; যদি তাহারাও এই ঘটনা দেখিয়া থাকে তবে সাব্যস্ত হইবে যে, মুহাম্মদ (সঃ) সত্যবাদী; সকলের উপর ত জাদুর তাসির হইতে পারে নাই; আর যদি ভিন্ন দেশের কেহই এই ঘটনা না দেখে তবে মনে করিবে, ইহা যাদু।

অতপর তাহারা বিদেশ ভ্রমণকারী আগন্তুকগণকে জিজ্ঞাসা করিল। অনেকেই বলিল, হাঁ– আমরা ঐরূপ ঘটনা দেখিয়াছি। এই সব প্রমাণ পাইয়া অন্তরান্ধ কাফের সর্দারগণ মন্তব্য করিল, বস্তুতঃ ইহা অতিশয় শক্তিশালী জাদু। (যোরকানী ১–১০৯)

এতদ্ভিন্ন উক্ত ঘটনা ভারতে দৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া প্রায় সাত শত বৎসর পূর্বে সঙ্কলিত "আল-বেদায়াহ ওয়ান নেহায়া" নামক প্রসিদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ আছে।

قد شوهد ذلك فى كثير من بقاع الارض ويقال انه ارخ ذلك بعض بلاد الهند -

অর্থাৎ, উক্ত ঘটনা বিশ্বের অনেক স্থানেই দেখা গিয়াছিল। কথিত আছে যে, ভারতেরও কোন কোন শহরে এই ঘটনা দৃষ্ট হওয়ার তারিখ লিখিত হইয়াছে।

পরবর্তী এক ইতিহাস লেখক ভারতস্থ "মালিবার" এলাকায় এই ঘটনা পরিদৃষ্ট হওয়ার কথা লিখিয়াছেন। মালিবার রাজ্যের শাসকদের রীতি ছিল, তাঁহারা বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলী লিপিবদ্ধরূপে রাজপুরীতে সংরক্ষণ করিত। তাহাদের লিপির মধ্যে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত দেখার ঘটনাও উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে। (তারীখে ফেরেশতা দ্রষ্টব্য)

এতদ্ভিন্ন এই ঘটনার বাস্তবতার প্রমাণে ইহাই যথেষ্ট যে, ইসলাম, মুসলমান ও হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বিরূদ্ধে সংগ্রামরত ইসলামের মূল উচ্ছেদকারী শত্রু, তৎকালীন আরব ও মক্কাবাসীরা কখনও মুসলমানদের এই বর্ণনাকে মিথ্যা বলিয়া চ্যালেঞ্জ করে নাই। তাহারা এই ঘটনাকে জাদু বলিয়া এই ঘটনার দ্বারা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সত্যতা প্রমাণিত হওয়ার প্রতিবাদ করিয়াছে, কিন্তু ঘটনার বিবরণ মিথ্যা তাহার বাস্তবতা অস্বীকার করে নাই। ঘটনার বাস্তবতা এতই উজ্জ্বল অকাট্য ছিল যে, মিথ্যা বলার এবং অস্বীকার করার কোন উপায়ই তাহাদের সম্মুখে ছিল না।*

---

* বিজ্ঞানের চরম উন্নতির ফলে মানুষ চন্দ্রে অবতরণ করিয়াছে। মানব জাতি হইতে ইসলামের বিপক্ষ দলকে বিজ্ঞানের এই চরম উন্নতির সুযোগ দান করিয়া তাহাদের দ্বারাই আল্লাহ তাআলা স্বীয় হাবীবের এই বিশেষ মো'জেযা চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার সত্যতা প্রমাণ করাইয়া দিয়াছেন।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রভাবশালী ও বহুল প্রচারিত সংবাদপত্র "দৈনিক ইত্তেফাক" ১৯৮১ সালের ১৪ ও ১৭ই মার্চ সংখ্যাদ্বয়ের উপসম্পাদকীয় কলাম হইতে একটি আলোচনার মূল বক্তব্য পাঠক সমক্ষে তুলিয়া ধরিতেছি–

"চাঁদে অবতরণকারী (আমেরিকার) সুপ্রসিদ্ধ মহাশূন্য বিজ্ঞানী নীল আমষ্ট্রংয়ের মুসলমান হওয়ার সংবাদটা লণ্ডনের ইম্প্যাক্ট পত্রিকায় প্রায় এক বছর আগে প্রকাশিত হয়। কিছুকাল আগে স্বীয় ধর্মান্তরের এক আলোচনায় নীল আমস্ট্রংয়ের সাক্ষাতকার প্রকাশিত হয়াছিল, তাতেও বিজ্ঞানী নীল আর্মস্ট্রং স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন, চাঁদে পদার্পণ করে আমার জীবনের অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। চাঁদ পুরাপুরিভাবেই দ্বিখণ্ডিত।"

চন্দ্র বিজয়ী মহাশূন্যচারী নীল আর্মষ্ট্রং ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হলেন– তাঁর সেই ইসলাম গ্রহণের পিছনে কাজ করেছিল চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ঘটনাটিই।

প্রকাশ , নীল আর্মস্ট্রংরা চাঁদে পরিভ্রমণকালে দেখতে পেয়েছিলেন যে, চাঁদে একটি ফাটল রয়েছে। এর সম্ভাব্য প্রমাণ ও তথ্যাদি তাঁরা সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন। সেই সব তথ্য প্রমাণ (আমেরিকার) মহাশূন্য গবেষণা কেন্দ্র "নাসাতে" বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। দেখা গেছে, চাঁদটি একবার সত্য সত্যই দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল এবং সেই দু'খণ্ডকে পুনরায় জোড়া

চাঁদ দ্বিখণ্ডিতকরণ মো'জেযার সময়কাল

এই মো'জেযাটি হিজরতের পাঁচ বছর পূর্বের ঘটনা। (যোরকানী ৫-১০৮)

ইহা যিলহজ্জ চাঁদের ১২-১৩ তারিখ অর্থাৎ চান্দ্র বৎসরের শেষ দিন কয়টির ঘটনা। আর হযরত (সঃ) হিজরত করিয়াছিলেন নবুয়তের ত্রয়োদশ বৎসরের প্রথম ভাগে; সুতরাং উক্ত ঘটনা নবুয়তের সপ্তম বৎসর যিলহজ্জ মাসে গণ্য করা হইলে তাহা হিজরতের পাঁচ বৎসর দুই আড়াই মাস পূর্বে সাব্যস্ত হয়।*

হযরতের বিভিন্ন মো'জেযা

রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বিভিন্ন কার্যে মো'জেযা প্রকাশ পাইত। ঐরূপ ঘটনাবলীর কতিপয় হাদীছও ইমাম বোখারী (রঃ) উল্লেখ করিয়াছেন।

১৭৯৩। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫০৪) আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কোন এক সফরে বাহির হইলেন, তাঁহার সঙ্গে কিছু সংখ্যক ছাহাবীও ছিলেন। পথিমধ্যে নামাযের ওয়াক্ত হইল, তাঁহার সঙ্গে পানির ব্যবস্থা ছিল না। এক ব্যক্তি একটি পাত্রে অল্প পরিমাণ পানি উপস্থিত করিল। নবী (সঃ) তাহা দ্বারা অযূ করিলেন; অতপর অঙ্গুলিসমূহ ঐ পাত্রে বিছাইয়া দিলেন এবং ঐ পাত্র হইতে অযূ করিবার জন্য সকলকে নির্দেশ দিলেন। সকলে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া অযূ করিলেন। তাঁহারা সংখ্যায় প্রায় সত্তর জন ছিলেন।

১৭৯৪। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫০৪) আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মদীনাস্থিত "যওরা" নামক স্থানে ছিলেন, (নামাযের ওয়াক্ত উপস্থিত হইল, পানির স্বল্পতা ছিল,) হযরত (সঃ) স্বীয় হস্ত একটি পানির পাত্রে রাখিয়া দিলেন, তৎক্ষণাত তাঁহার আঙ্গুলসমূহের ফাঁক দিয়া পানি উথলিয়া উঠিতে লাগিল। ঐ পানি দ্বারা উপস্থিত সকলে উত্তমরূপে অযূ করিলেন। আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা প্রায় তিন শত ছিল।

১৭৯৫। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫০৫) আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কিছু সংখ্যক ছাহাবীর সঙ্গে এক স্থানে ছিলেন, এমতাবস্থায় নামাযের ওয়াক্ত উপস্থিত হইল। যাহাদের বাড়ী নিকটবর্তী ছিল তাহারা অযূ করিবার জন্য নিজ নিজ বাড়ীতে চলিয়া গেল। কিছু সংখ্যক লোক এমনও ছিলেন যাঁহাদের বাড়ী-ঘর নিকটবর্তী ছিল না।

তখন হযরতের সম্মুখে একটি পাত্র উপস্থিত করা হইল, হযরত (সঃ) তাহার মধ্যে হস্ত মোবারক

দেয়া হয়েছে। "নাসার" বিজ্ঞানীরা তাঁদের গবেষণার এই প্রমাণও উদ্ধার করতে পেরেছেন যে, চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ঘটনাটি ঘটেছিল প্রায় ১৪০০ বছর আগে। চৌদ্দশ' বছর আগে অলৌকিক ঘটনা হিসাবে মহানবী (সঃ) যে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করেছিলেন, সে বিবরণ নীল আর্মস্ট্রং এর আগেই পড়েছিল। "নাসার" বিজ্ঞানীদের এই গবেষণার ফলাফল প্রকাশের পরেই তিনি আর দেরী না করে ইসলাম কবুল করেন।

এই ধরনের অলৌকিক ঘটনা সম্পর্কে মরহুম মাওলানা মুহাম্মদ আকরম খাঁর বিরূপ অভিমত কারো অজানা নয়। কিন্তু তিনিও তাঁর "মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসে"এ ঘটনার উল্লেখ করে গেছেন। ইতিহাস থেকে প্রমাণ দিয়েছেন যে, দাক্ষিণাত্যের জনৈক রাজা বেরুখান পেরুমল এই চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ঘটনা প্রত্যক্ষ করে স্বয়ং মহানবীর (সঃ) কাছে গিয়ে ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন।

* এই হিসাব মতে দেখা যায় যে, যাঁহাদের মতে হযরতের বিরুদ্ধে মক্কাবাসী কাফেরগণের বয়কট বা অসহযোগিতা নবুয়তের অষ্টম বৎসরে আরম্ভ হইয়াছিল, তাহাদের মতানুসারে উক্ত মো'জেযা বয়কটের পূর্বে সাব্যস্ত হইবে। আর যাঁহাদের মতে বয়কট নবুয়তের সপ্তম বৎসরের প্রথম হইতেই ছিল তাহাদের মতানুসারে উক্ত মো'জেযার ঘটনা বয়কটের সময়ে সাব্যস্ত হইবে। যদিও কাফেররা হযরতের বিরুদ্ধে বয়কট ও অসহযোগিতা করিয়া যাইতেছিল, কিন্তু তিনি মুহূর্তের জন্যও ইসলামের তবলীগ কার্য ক্ষান্ত করেন নাই। (আসাহুস সিয়ার ৯৪)। এবং তাঁহারা হজ্জের সময় হজ্জের অনুষ্ঠানাদিও সম্পন্ন করিয়া থাকিতেন।

(যোরকানী ১-২৭৯)

ছড়াইয়া রাখিতে চাহিলেন, কিন্তু পাত্রটি সঙ্কীর্ণ ছিল, তাই তিনি হাতের আঙ্গুলসমূহ একত্রিতরূপে তাহার মধ্যে প্রবেশ করাইলেন, অতপর তাহা হইতে উপস্থিত সকলে অযূ করিল– তাহাদের সংখ্যা আশি জন ছিল।

১৭৯৬। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫০৪) আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, সাধারণতঃ লোকেরা ধারণা করিয়া থাকে যে, মো'জেযাসমূহ আল্লাহর আযাব সম্বলিত ঘটনাই হইয়া থাকে। আমরা মো'জেযার মধ্যে লাভজনক ঘটনাও পাইয়াছি।

আমরা রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। নামাযের ওয়াক্ত উপস্থিত হইল, কিন্তু পানি অতি সামান্য ছিল। হযরত (সঃ) বলিলেন, একটু পানি আমার নিকট উপস্থিত কর। একটি পাত্রে অতি সামান্য একটু পানি উপস্থিত করা হইল। হযরত (সঃ) স্বীয় হস্ত ঐ পাত্রে রাখিয়া দিলেন এবং সকলকে বলিলেন, তোমরা আল্লাহর তরফ হইতে বরকতের পানি দ্বারা অযূ করিতে আস।

আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন, আমি ঐ ঘটনায় দেখিয়াছি, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আঙ্গুলের ফাঁক দিয়া পানি উথলিয়া উঠিতেছে।

এতদ্ভিন্ন হযরতের এই মো'জেযাও আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, খাদ্য বস্তুসমূহ তসবীহ পড়িয়া থাকিত এবং আমরা তাহা শুনিতে পাইতাম।

১৭৯৭। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫০৬) আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম (তাঁহার মসজিদের মিম্বর তৈয়ার হওয়ার পূর্বে) একটি শুষ্ক খেজুর গাছের খুঁটির সহিত হেলান দিয়া জুমার খোতবা ইত্যাদি ভাষণ দিয়া থাকিতেন। মিম্বর তৈয়ার হইলে পর জুমার খোতবাদানে তিনি ঐ খুঁটি ত্যাগ করতঃ মিম্বরে দাঁড়াইলেন; তখন ঐ খেজুর কাণ্ডটি (শিশুর ন্যায় বা বাছুরহারা গাভীর ন্যায়) রোদন করিতে লাগিল (তাহার ক্রন্দন স্বর আমরা শুনিয়াছি)। অতপর হযরত (সঃ) মিম্বর হইতে অবতরণ করিয়া তাহার নিকটে আসিলেন, তাহার উপর হাত বুলাইলেন (এবং আলিঙ্গন করিলেন)। তখন ধীরে ধীরে তাহার ক্রন্দন স্বর থামিয়া আসিল, যেরূপ ক্রন্দনরত শিশুকে সান্ত্বনা দান করা হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যাঃ হাসান (রঃ) বর্ণনা করয়া বলিলেন, হে মুসলমানগণ! একটি শুষ্ক কাঠ হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহ অসাল্লামের প্রতি এত অনুরক্ত ও আসক্ত ছিল; তোমরা ত মানুষ– তোমাদের পক্ষে ঐরূপ হওয়া অধিক বাঞ্ছনীয় নহে কি?

এক হাদীছে উল্লেখ আছে, এই ঘটনা উপলক্ষে হযরত (সঃ) লোকদিগকে বলিলেন, এই শুষ্ক কাষ্টের ক্রন্দনে তোমাদের অন্তরে বিস্ময় সৃষ্টি হয় না কি? তখন বহু লোক সেদিকে লক্ষ্য করিল এবং ক্রন্দনের রোল পড়িয়া গেল।

উক্ত খেজুর কাণ্ডটি সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীছে অনেক তথ্য আছে। যথা– (১) তাহাকে হযরত (সঃ) বলিয়াছিলেন, তুমি ইচ্ছা করিলে আমি তোমাকে পুনঃ তোমার স্থানে নিয়া রোপণ করিয়া দেই, তুমি তাজা গাছ হইয়া যাইবে। আর ইচ্ছা করিলে আমি তোমাকে বেহেশতে রোপণ করিতে পারি, তুমি বেহেশতের মাটি ও পানিতে পুষ্ট হইয়া আল্লাহর পেয়ারা বান্দাগণকে ফল খাওয়াইবে। হযরত (সঃ) বলিয়াছেন, সেই খেজুর কাণ্ডটি দ্বিতীয় ব্যবস্থাই পছন্দ করিয়াছে।

(২) হযরত (সঃ) সাময়িক খেজুর কাণ্ডটি দাফন করাইয়া দিয়াছেন।

(৩) পরবর্তীকালে ঐ খেজুর কাণ্ডটি ছাহাবী উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)-এর হস্তগত হইয়া তাঁহারই হেফাযতে ছিল, এমনকি কালের পরিবর্তনে ধীরে ধীরে তাহার বিলুপ্তি সাধিত হয়। আলেমগণ লিখিয়াছেন যে, দাফনকৃত খেজুর কাণ্ডটি বোধহয় মসজিদে নববীর পুনঃ নির্মাণকালে উক্ত ছাহাবীর হস্তগত হইয়াছিল।

বৃক্ষ জাতীয় খেজুর কাণ্ডের মধ্যে ক্রন্দন ও কথোপকথনের শক্তি সঞ্চার হওয়া অসম্ভব মনে করিবে না। শুধু বৃক্ষ নহে বরং সমস্ত বস্তুই আল্লাহ তাআলার তসবীহ পড়িয়া থাকে– এই সত্য পবিত্র কোরআনেই নিম্নের

আয়াতে বর্ণিত আছে- وَاِنْ مِّنْ شَيْئٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لاَّتَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ـ

অর্থ ঃ "নিশ্চয় প্রত্যেক বস্তু আল্লাহ তাআলার প্রশংসা পবিত্রতার গুণ গাহিয়া থাকে, অবশ্য তোমরা তাহাদের তসবীহ বুঝিতে পার না।"

অবশ্য শুষ্ক অবস্থায় উক্ত খেজুর কাণ্ডের মধ্যে সেই শক্তির সঞ্চার হওয়া এবং জনসাধারণ কর্তৃক শ্রুত ক্রন্দন ও রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সাথে কথোপকথনের শক্তি তথা মানবীয় শক্তির ন্যায় শক্তি সঞ্চার হওয়া প্রিয়নবী মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বিশেষ মো'জেযা স্বরূপ ছিল।

একদা ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলিলেন, হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ন্যায় বড় বড় মো'জেযা অন্য কোন নবীকে দেওয়া হয় নাই। এক ব্যক্তি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া বলিল, হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামকে মরা মানুষ জীবিত করার মো'জেযা দেওয়া হইয়াছিল। ইমাম শাফেয়ী (রঃ) তদুত্তরে উক্ত খেজুর খাম্বার ঘটনা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, ইহাতে মৃতকে জীবিত করার তুলনায় অধিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। কারণ, এস্থলে একটি মরা কাষ্ঠে মানবীয় শক্তির সঞ্চার হইয়াছে। (উল্লিখিত তথ্যসমূহ "ফতহুল বারী" হইতে উদ্ধৃত)

১৭৯৮। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫১১) আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একজন খৃষ্টান মুসলমান হইয়াছিল, এমনকি সে পবিত্র কোরআনের সূরা বাকারা এবং সূরা আলে এমরানের শিক্ষাও লাভ করিয়াছিল। সে হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু অলাইহি অসাল্লামের প্রয়োজনীয় লেখার কাজ করিত। কিছু দিন পরে সে পুনরায় খৃষ্টান হইয়া গেল। সে হযরতের কুৎসা করিয়া বলিত যে, মুহাম্মদ বস্তুতঃ কিছুই জানে না, আমার লিখিত বিষয়াবলী দেখিয়াই যাহা কিছু লিখিয়াছে।

অল্প দিনের মধ্যেই ঐ ব্যক্তির মৃত্যু হইল। তাহার লোকজন তাহাকে খৃষ্টান ধর্মের রীতি অনুসারে মাটিতে দাফন করিয়া দিল। পরদিন ভোরবেলা দেখা গেল, মাটি তাহাকে ভিতর হইতে বাহিরে ফেলিয়া রাখিয়াছে। তাহার লোকজন মুসলমানদের প্রতি দোষারোপ করিয়া বলিল, তাহারাই এইরূপ করিয়াছে, আমাদের লোকটিকে কবর খুঁড়িয়া বাহিরে ফেলিয়া রাখিয়াছে। তাহারা পুনরায় অধিক মাটির নীচে তাহাকে দাফন করিয়া দিল; এইবারও ভোরবেলা পূর্বের ন্যায় মাটির উপরেই তাহার লাশ দেখা গেল। তাহার লোকজন আবার মুসলমানদের প্রতি দোষারোপ করতঃ যথাসাধ্য মাটির তলদেশে তাহাকে দাফন করিয়া দিল, কিন্তু এইবারও ভোরবেলা তাহাকে মাটির উপর দেখা গেল। তখন সকলেই বুঝিতে পারিল যে, এই কার্য কোন মানুষের পক্ষ হইতে নহে। সুতরাং শেষ পর্যন্ত তাহাকে ঐ অবস্থায়ই ফেলিয়া রাখা হইল।

ব্যাখ্যা ঃ হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সঙ্গে বে-আদবী গোস্তাখীর কি পরিণতি তাহার আভাসদানে আল্লাহ তাআলা এই ঘটনা ঘটাইয়াছিলেন যে, ঐ ব্যক্তির ধ্বংসাবশেষ অপদস্থতার মধ্যে নিশ্চিহ্ন ও বিলুপ্ত হইয়াছিল।

১৭৯৯। হাদীছ ঃ খন্দকের জেহাদ উপলক্ষে পরিখা খননের সময়ে ক্ষুধার দুর্বলতায় নবী (সঃ) কাপড় দ্বারা পেটে পাথর বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, আবু তালহা (রাঃ) (নবীজীর ঐ অবস্থা অবলোকন করিয়া বাড়ী আসিলেন এবং স্ত্রী উম্মে সোলায়েমকে বলিলেন, আমি রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে দেখিয়া আসিলাম- ক্ষুধার কারণে তাঁহার মুখ হইতে ভালভাবে শব্দও বাহির হয় না। তোমার নিকট খাওয়ার কিছু আছে কি? স্ত্রী বলিলেন, হাঁ- আছে; এই বলিয়া তিনি কয়েকটি যবের রুটি বাহির করিলেন এবং একটি চাদর বাহির করিয়া তাহার এক অংশে ঐ রুটিগুলি লেপটাইয়া আমার বগলে দাবাইয়া দিলেন এবং চাদরের বাকী অংশ দ্বারা আমার গা ঢাকিয়া দিলেন- (আনাছ তখন বালক) এই অবস্থায় তিনি আমাকে হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। আমি মসজিদে যাইয়া হযরত (সঃ)-কে পাইলাম, তাঁহার নিকট অনেক লোক ছিল। আমি যাইয়া তথায়

দাঁড়াইলাম। হযরত (সঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আবু তাল্‌হা তোমাকে পাঠাইয়াছে? আমি আরজ করিলাম, হাঁ। তিনি বলিলেন, খাদ্য দিয়া পাঠাইয়াছে? আমি আরজ করিলাম, হাঁ। তখন হযরত (সঃ) উপস্থিত সকলকে বলিলেন, তোমরা সকলে চল (আবু তাল্‌হার বাড়ীতে দাওয়াত খাওয়ার জন্য)।

এই বলিয়া সকলে রওয়ানা হইলেন। আমি তাঁহাদের সম্মুখ ভাগে পথ দেখাইয়া চলিলাম এবং আবু তাল্‌হা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নিকট আসিয়া তাঁহাকে বিস্তারিত খবর জ্ঞাত করিলাম। আবু তাল্‌হা তাঁহার স্ত্রী উম্মে সোলায়েমকে বলিলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) অনেক লোক সঙ্গে করিয়া আমাদের বাড়ী তশরীফ আনিতেছেন, অথচ আমাদের নিকট কোন ব্যবস্থা নাই যে, আমরা তাঁহাদিগকে খাবার দিতে পারি। উম্মে সোলায়েম বলিলেন, আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূল আমাদের অবস্থা ভালভাবেই জ্ঞাত আছেন (সুতরাং আমাদের চিন্তা করার আবশ্যক নাই)। আবু তাল্‌হা (রাঃ) বাড়ী হইতে বাহির হইয়া রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে অভ্যর্থনা করিয়া নিয়া আসিলেন। হযরত (সঃ) আবু তাল্‌হা সমভিব্যাহারে বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন এবং বলিলেন, হে উম্মে সোলায়েম! তোমার নিকট খাদ্য যাহা কিছু আছে উপস্থিত কর। উম্মে সোলায়েম সেই রুটি কয়টি যাহা আমার সঙ্গে পাঠাইয়াছিলেন উপস্থিত করিলেন। হযরতের আদেশে রুটিগুলি খণ্ড খণ্ড করা হইল। উম্মে সোলায়েম ঐগুলির উপর কিছু ঘৃত ঢালিয়া দিলেন। অতপর হযরত (সঃ) তাহার উপর কিছু পড়িয়া দোয়া করিলেন * এবং বলিলেন, লোকদের মধ্য হইতে দশ জনকে ডাকিয়া আন। তাহারা আসিয়া পেট পুরিয়া খাইলেন। অতপর আরও দশ জনকে ডাকিয়া আনা হইল, তাহারাও পেট পুরিয়া খাইলেন। এইভাবে উপস্থিত সকলেই পেট পুরিয়া খাইলেন, তাহাদের সংখ্যা বরং আশি ছিল। (তারপর হযরত (সঃ) বাড়ীর সকলকে নিয়া খাইলেন তবুও খাদ্য বাঁচিয়া গেল– তাহা পড়শীগণের মধ্যে বিতরণ করা হইল। (ফতহুল বারী)

আলোচ্য ঘটনা অপেক্ষা অধিক আশ্চর্যের আরও একটি ঘটনা ঐ খন্দকের জেহাদ উপলক্ষেই ছাহাবী জাবের (রাঃ)-এর সঙ্গে ঘটিয়াছিল। তিনি মাত্র তিন জন লোকের উপযোগী খাদ্য তৈয়ারীর ব্যবস্থা করিয়া হযরত (সঃ)-কে চুপি চুপি দাওয়াত করিয়াছিলেন, কিন্তু হযরত (সঃ) ব্যাপকভাবে দাওয়াতের ঘোষণা দিয়া জাবেরের বাড়ী উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং হযরতের মো'জেযায় সেই তিন জনের খাদ্য এক হাজার লোকে খাওয়ার পরেও অবশিষ্ট রহিল।

ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে ১৪৭৩ নং হাদীছে রহিয়াছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ ইমাম বোখারী (রঃ) আরও কতিপয় মো'জেযার ঘটনা সম্বলিত হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু সেই সব হাদীছের অনুবাদ পূর্বে হইয়া গিয়াছে, যেমন– প্রথম খণ্ডের ২৩১নং, ৩৭০নং ও ৫২১ নং হাদীছ এবং দ্বিতীয় খণ্ডের ১১৬২ নং তৃতীয় খণ্ডের ১৪৯৭ নং ও ১৪৯৮ নং হাদীছ। এতদ্ভিন্ন আরও কতিপয় হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন যাহা আখেরী যমানা সম্পর্কে বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত; যথাস্থানে ইনশাআল্লাহ তাহা অনূদিত হইবে।

হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আর একটি অন্যতম বিশেষ মো'জেযা হইল মে'রাজ শরীফের ঘটনা। ইমাম বোখারী (রঃ)ও এই ঘটনা বিশেষ গুরুত্বের সহিত ৫৪৮ পৃষ্ঠায় দুইটি পরিচ্ছেদে উল্লেখ করিয়াছেন।

মে'রাজ শরীফের বয়ান

মে'রাজ শব্দের অর্থ সিঁড়ি বা সোপান, যদ্দ্বারা ঊর্ধ্বে আরোহণ করা যায়। মে'রাজের ঘটনা বলিতে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বিশেষ এক ঐতিহাসিক ঘটনা উদ্দেশ্য; যেই ঘটনায় হযরত (সঃ) সাত আসমান ও তদূর্ধ্বে "মহান আরশ" এবং তাহারও ঊর্ধ্বে বিশেষ জগত পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। সেই

* হযরত (সঃ) এই দোয়া পড়িয়াছিলেন بسم الله اللهم اعظم فيها البركة "আল্লাহর নামে– হে আল্লাহ! এই খাদ্যে বেশী মাত্রায় বরকত দান করুন।"

ঘটনা বা তাহার এক অংশকে আরবি ভাষায় ইসরাও* বলা হয়, যাহার অর্থ রাত্রিকালের ভ্রমণ। এই ঘটনা রাত্রিকালে ঘটিয়াছিল বলিয়া এই শব্দ ব্যবহার করা হয়। পবিত্র কোরআনে এই শব্দেই উক্ত ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে।

ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, কোন এক রাত্রিতে হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) আল্লাহ তাআলার বিশেষ আমন্ত্রণক্রমে এবং বিশেষ ব্যবস্থাধীনে জিব্রাঈল ফেরেশতার পরিচালনায় মক্কা হইতে প্রায় এক মাসের পথ বায়তুল মোকাদ্দাস মসজিদ হইয়া তথা হইতে পর পর সাত আসমানে ভ্রমণ করেন এবং সপ্তম আসমান হইতে মহান আরশ, অতপর তাহারও ঊর্ধ্বে সৃষ্ট জগতের বহুস্তর পরিভ্রমণ করেন এবং বরযখী জগত, বেহেশত, দোযখ, লওহে মাহফুজ, বায়তুল মা'মুর, হাউজ কাওসার, সেদরাতুল মোনতাহা, আরশ-কুরসী ইত্যাদি সহ আল্লাহ তাআলার কুদরতের ও তাঁহার বিশেষ সৃষ্টির বহু রকম অলৌকিক অসাধারণ বস্তু পরিদর্শন করেন।

অবশেষে আল্লাহ তাআলার বিশেষ দরবারে উপস্থিতি লাভ করেন, আল্লাহ তাআলার সঙ্গে কালাম বা কথাবার্তার সুযোগ লাভ করেন, এমনকি (অধিকাংশের মতে) স্বচক্ষে আল্লাহ তাআলার সাক্ষাতও লাভ করেন। ইহজগতের বাহিরে এই সুদীর্ঘ পরিভ্রমণ সংঘটিত হয় এবং তথা হইতে হযরত (সঃ) প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু তাঁহার এই পরিভ্রমণের আরম্ভ ও প্রত্যাবর্তন জাগতিক সময়ের হিসাবে ঐ রাত্রের এক অংশ মাত্র ছিল। তাঁহার পরিভ্রমণ ও পরিদর্শন সম্পূর্ণ বাস্তব এবং যথার্থ সত্য ঘটনা ছিল। কোন প্রকার রূপক বা স্বপ্ন পর্যায়ের মোটেই ছিল না, অবশ্য সব কিছু সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলার কুদরত ছিল বটে।

মে'রাজ শরীফের তাৎপর্য

রসূল ও নবী মানব জাতির জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারক (Reformer)। মানুষ ভুলিয়া যায় তাহার সৃষ্টিকর্তাকে এবং তাঁহার সহিত সম্পর্ক। সে ভুলিয়া যায় তাঁহার বিচার, ভুলিয়া যায় তাঁহার বিচারের ফলাফল– প্রতিদান বা শাস্তি। ভুলিয়া যায় তাহার সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক তাহার উপর ন্যস্ত কর্তব্যাবলী, ছিন্ন হইয়া যায় সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে তাহার সম্পর্ক। মানুষ এই সবকে ভুলিয়া যায়, অনেক স্থলে এই সবের অস্বীকারকারী হইয়া বসে, অনেক স্থলে এইসবের বিপরীত বিষয় গ্রহণ ও বরণ করিয়া লয়। এইসব অবস্থা মানব জীবনের কলঙ্ক ও কুসংস্কার। এইসবের ব্যাপকতার পরিপ্রেক্ষিতেই রসূল ও নবীগণের আবির্ভাব হইয়া থাকিত; তাঁহারা মানবের ইহকালীন জীবনের দায়িত্ব কর্তব্য এবং পরকালীন জীবনের ফলাফল ও তথ্যাদি স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার তরফ হইতে মানবকে জ্ঞাত করিতেন এবং এই জ্ঞান দানের মাধ্যমেই নবী ও রসূলগণ মানব সমাজের ঐ অধঃপতনের সংস্কার সাধন করিতেন।

দুনিয়া অস্থায়ী, এইখানে মানব জাতির আবাদিও অস্থায়ী সুতরাং রসূল এবং নবীগণের সেলসেলারও শেষ সীমা রহিয়াছে। সেই সর্বশেষ রসূল ও নবী হইলেন আমাদের পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম। তাঁহার পর আর কোন নবী বা রসূল আসিবে না, তাঁহার সংস্কারই কেয়ামত পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হইবে। অতএব সাধারণ নিয়মানুসারেই তাঁহার সংস্কার সর্বাধিক সুদৃঢ় ও দীর্ঘজীবী হওয়া আবশ্যক। সংস্কারকের ছায়া তথা তাঁহার সংস্কার দীর্ঘজীবী ও সুদৃঢ় হয় তাঁহার সংস্কারের বিষয়াবলী তথা তাঁহার উক্তি এবং বক্তব্যাবলীর উপর তাঁহার নিজের বিশ্বাসের অকাট্যতা ও দৃঢ়তা অনুপাতে।

"ইস্‌রা" অর্থ রাত্রিকালের ভ্রমণ এবং "মে'রাজ" অর্থ ঊর্ধ্বে আরোহণ। আলোচ্য ঘটনায় উভয় কার্যই সংঘটিত হইয়াছিল। মক্কা হইতে বায়তুল মোকাদ্দাস মসজিদ পর্যন্ত এক মাসের পথ ত নবী (সঃ) ঐ রাত্রে ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং তথা হইতে ঊর্ধ্বে আরোহণ করিয়াছিলেন। ফলে সাধারণতঃ উভয় শব্দই সম্পূর্ণ ঘটনার জন্য ব্যবহার করা হয়। আর কাহারও মতে ঘটনার প্রথম অংশের জন্য "ইস্‌রা" শব্দ এবং দ্বিতীয় অংশের জন্য 'মে'রাজ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইমাম বোখারী (রঃ) এই মতামতকেই সমর্থন করেন বলিয়া মনে হয়। কারণ তিনি ভিন্ন ভিন্ন দুইটি পরিচ্ছেদ উল্লেখ করিয়াছেন– একটি পরিচ্ছেদে একটি পরিচ্ছেদে 'মে'রাজ' আর 'ইস্‌রা'।

পূর্ববর্তী নবীগণ যেসব বিষয় লোকদিগকে জ্ঞাত করিয়াছেন, যেমন– আল্লাহ তাআলা সম্বন্ধে জ্ঞাত করিয়াছেন, আরশ-কুরসী বেহশত-দোযখ ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞাত করিয়াছেন এবং নেক-বদ আমলের প্রতিদান ও শাস্তি জ্ঞাত করিয়াছেন; এই সব কিছু তাঁহারা জ্ঞাত হইতেন ওহী দ্বারা। ওহী নির্ভুল অকাট্য হওয়া সম্পর্কে কোন সন্দেহের লেশমাত্র থাকিতে পারে না, কিন্তু ওহী অকাট্য নির্ভুল হইলেও তাহা শুধু শুনা পর্যায়ের; দেখা পর্যায়ের নহে। শুনা পর্যায়ের অকাট্যতা সন্দেহ দূরীভূত করার জন্য এবং পূর্ণ ঈমানের জন্য যথেষ্ট ইহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা দেখা পর্যায়ের অকাট্যতার সমতুল্য নহে; شنیدہ کئے بود مانند دیدہ শুনা কখনও দেখার সমতুল্য হইতে পারে না!" এই মর্মে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) মৃতকে পুনর্জীবিত করার দৃশ্য চাক্ষুষ দেখিয়া নেওয়ার দরখাস্ত আল্লাহ তাআলার দরবারে করিয়াছিলেন– যাহার বিবরণ চতুর্থ খণ্ডে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর আলোচনায় দ্রষ্টব্য।

আল্লাহ তাআলা সর্বশেষ পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ছায়া তথা তাঁহার সংস্কার (reform) সর্বাধিক দীর্ঘস্থায়ী, দীর্ঘজীবী ও সুদৃঢ় করার ব্যবস্থাস্বরূপ সব কিছু দেখাইয়া দিবার জন্য এই বিশেষ পরিভ্রমণের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের ঘোষণা–

سُبْحٰنَ الَّذِیْٓ اَسْرٰی بِعَبْدِہٖ لَیْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَی الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِیْ بَارَکْنَا حَوْلَہٗ لِنُرِیَہٗ مِنْ اٰیٰتِنَا ۔

অর্থ ঃ অতি মহান পাক-পবিত্র আল্লাহ; যিনি স্বীয় বিশিষ্ট বান্দা (মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-কে রাত্রি বেলায় মক্কার মসজিদ হইতে বায়তুল মোকাদ্দাস মসজিদের পথে পরিভ্রমণে নিয়াছেন, (তিনি স্বয়ং সেই পরিভ্রমণের) উদ্দেশ্য এই (প্রকাশ করিতেছেন) যে, আমি তাঁহাকে আমার (কুদরতের এবং সৃষ্টির) অনেক নিদর্শন ও অলৌকিক বস্তুনিচয় পরিদর্শন করাইব। (পারা–১৫; রুকু– ১)

এই পরিভ্রমণের মাধ্যমে হযরত (সঃ) সব কিছু দেখিয়াছেন– বরযখী জগত দেখিয়াছেন, পূর্ববর্তী নবীগণ যাহাদের ইতিহাস বিশ্ববাসীকে শুনাইবেন তাঁহাদিগকে দেখিয়াছেন, নেক-বদ আমলের প্রতিদান ও শাস্তি দেখিয়াছেন; আরও দেখিয়াছেন বেহেশত-দোযখ, আরশ কুরসী, বায়তুল মা'মুর, সেদরাতুল মোনতাহা, লওহে মাফুজ, হাউজে কাওসার ইত্যাদি, এমনকি সম্ভাব্য পরিমাণে মহান আল্লাহকেও দেখিয়াছেন।

পবিত্র কোরআনে অন্য এক প্রসঙ্গে হযরতের এই পরিভ্রমণের উল্লেখ রহিয়াছে–

وَلَقَدْ رَاٰہُ نَزْلَۃً اُخْرٰی عِنْدَ سِدْرَۃِ الْمُنْتَھٰی ۔ عِنْدَھَا جَنَّۃُ الْمَاْوٰی ۔ اِذْ یَغْشَی السِّدْرَۃَ مَا یَغْشٰی ۔ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰی لَقَدْ رَاٰی مِنْ اٰیٰتِ رَبِّہِ الْکُبْرٰی ۔

অর্থাৎ হযরত (সঃ) সেদরাতুল মোনতাহার নিকট পৌঁছিয়াছিলেন; ঐ এলাকায়ই চির বাসস্থান বেহেশত অবস্থিত। তখন (তথায় হযরতের আগমন উপলক্ষে) এক বিশেষ রকমের সজ্জা সেদরাতুল মোনতাহাকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছিল। (সেই এলাকায় পৌঁছিয়াও) হযরতের পরিদর্শন ও অনুধাবনশক্তি সম্পূর্ণ সুস্থ সতেজ সঠিক ও বিমল ছিল; পরিদর্শন ও অনুধাবনে কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল না। হযরত (সঃ) তথায় স্বীয় প্রভু পরওয়ারদেগারের বহু রকম বড় বড় নিদর্শন ও বস্তুনিচয় পরিদর্শন করিয়াছিলেন। (পারা-২৭, রুকু-৫)

এইভাবে ইসলামের আকীদা বিশ্বাসী অদৃশ্য অলৌকিক বস্তুনিচয় যাহা অন্যান্য নবীগণের পক্ষে শুধু ওহী মারফত তথা শুনা পর্যায়ের অকাট্য ছিল; মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পক্ষে ঐসব বস্তুনিচয় দেখা পর্যায়ের অকাট্যতায় পরিণত হইয়াছিল। ফলে তাঁহার প্রচারিত ও বক্তব্য বিষয়াবলী সম্পর্কে তাঁহার একীন বিশ্বাস ছিল সর্বাধিক দৃঢ়; যদ্দরুন তাঁহার ছায়া তথা তাঁহার সংস্কার (reform) দীর্ঘজীবী ও সুদৃঢ় হইয়াছে।

'মে'রাজ' হযরতের পক্ষে আদর সোহাগের মোলাকাত ছিল

নবুয়ত প্রাপ্তির পর দীর্ঘ নয় বৎসরকাল হযরত (সঃ) দুঃখ-যাতনার ভিতর দিয়া কাটাইয়াছেন– দশম বৎসরে তাঁহার মানসিক ও দৈহিক কষ্ট চরমে পৌঁছিল। ইহজগতে তাঁহার একমাত্র রক্ষণাবেক্ষণকারী, সাহায্য সমর্থন দানকারী চাচা আবু তালেবের মৃত্যু হইল, এই বৎসরই পরম প্রতিভাশালিনী জীবনসঙ্গিনী বিবি খাদীজারও ইন্তেকাল হইয়া গেল। হযরত (সঃ) শত্রু বেষ্টনীর মধ্যে ঘরে বাহিরে নিঃসঙ্গ হইয়া পড়িলেন, এমনকি হযরত স্বয়ং এই বৎসরকে عام الحزن শোকের বৎসর নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। তদুপরি তায়েফ নগরীর ঘটনা ত তাঁহার ব্যথিত হৃদয়কে আরও ঘায়েল করিয়াছিল।

রহমানুর রহীম আল্লাহ তাআলার সাধারণ নিয়ম– যাহা তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন–

اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ـ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ـ

অর্থ ঃ "কষ্টের সঙ্গে মিষ্ট থাকে, কষ্টের সঙ্গেই মিষ্ট থাকে।"

আল্লাহ তাআলার এই সাধারণ নিয়মটি তাঁহার আওলিয়া– দোস্ত ও পেয়ারা বন্দাদের পক্ষে বিশেষরূপে বাস্তবায়িত হইয়া থাকে। এস্থলে আল্লাহ তাআলার সর্বশ্রেষ্ঠ পেয়ারা হাবীব সর্বাধিক দুঃখ-যাতনা ভোগ করিলেন, তাঁহার জীবনের সর্বাধিক ব্যথা ও আঘাতে তিনি মর্মাহত হইলেন, এই ক্ষেত্রে কি আল্লাহ তাআলা তাঁহার সেই সাধারণ নিয়ম– "কষ্টের সঙ্গে মিষ্ট" বাস্তবায়িত করিবেন না? নিশ্চয়ই করিবেন; রহমানুর রাহীম আল্লাহ তাআলা তাহাই করিয়াছেন।

দশম বৎসরে হযরত (সঃ) আন্তরিক ও বাহ্যিক উভয় দিক দিয়া ব্যথা ও দুঃখ-যাতনার চরম অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছিলেন। চাচা আবু তালেব ও জীবনসঙ্গিনী বিবি খাদীজার ইন্তেকালে ত আন্তরিক ব্যথায় বিহ্বল হইয়াছিলেন, আর তায়েফের ঘটনায় বাহ্যিক দুঃখ-যাতনার চরমে পৌঁছিয়াছিলেন। এই দুই প্রকার কষ্টের প্রতিদান স্বরূপ দুই প্রকার মিষ্ট আল্লাহ তাআলা হযরতকে দান করিয়াছিলেন; একটি বাহ্যিক দ্বিতীয়টি আধ্যাত্মিক। বাহ্যিক মিষ্ট ও নেয়ামতটি ছিল মদীনাবাসীদের সঙ্গে হযরতের সংযোগ সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার সুযোগ– যাহার উপর ভিত্তি করিয়া মদীনায় ইসলামের কেন্দ্র স্থাপিত হয় এবং হযরত (সঃ) এক মস্ত বড় জাতিকে তাঁহার সাহায্য সমর্থন ও সহায়তায় সর্বস্ব উৎসর্গকারীরূপে দণ্ডায়মান পান। এমনকি অচিরেই ইসলাম রাজনৈতিক ক্ষমতা ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদা লাভ করিতে সক্ষম হয়। ইহার সূচনা নবুয়তের দশম বৎসরের শেষ কয়টি দিনে হইয়াছিল, যাহার বিস্তারিত বিবরণ "আকাবা সম্মেলন" বিষয়ে বর্ণিত হইয়াছে।

আধ্যাত্মিক মিষ্ট ও নেয়ামতটি ছিল এই মে'রাজ শরীফ। যাহা একমাত্র হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ব্যতীত অন্য কোন নবী–রসূল, ফেরেশতা তথা কোন সৃষ্টের ভাগ্যেই জুটে নাই। নবুয়তের একাদশ বা দ্বাদশ বৎসরের রজব মাসে এই ঘটনা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই উপলক্ষে সমস্ত নবীগণকে হযরত (সঃ)-এর পিছনে মোক্তাদীরূপে দাঁড় করাইয়া তিনি যে তাঁহাদের সর্দার, তাহা আনুষ্ঠানিকরূপে দেখান হয়। হযরত (সঃ) এত উর্ধ্বে আরোহণ করেন যে, ঐশী বাহন বোরাকও তাঁহার সঙ্গ ত্যাগে বাধ্য হন। স্বয়ং আল্লাহ তাআলার সঙ্গে হযরতের সালাম-কালাম বিনিময় হয়। আল্লাহ তাআলা হযরতকে আদর সোহাগ করিয়া তাঁহার সৃষ্টি কারখানার অলৌকিক অসাধারণ বস্তুনিচয় পরিদর্শন করান। এইসব ত হইল মে'রাজ শরীফের শুধু বাহ্যিক গুটিকয়েক বিষয়ের ইঙ্গিত মাত্র। প্রকৃত প্রস্তাবে হযরত (সঃ) মে'রাজ শরীফের মাধ্যমে কি অসীম মর্যাদা যে লাভ করিয়াছিলেন এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির সোপানে আরোহণ করিয়া কোথায় যে তিনি পৌঁছিয়াছিলেন তাহা বুঝা ও বুঝান মানুষের পক্ষে বস্তুতঃ সম্ভব নহে। কবি ঠিকই বলিয়াছেন–

لا يُمْكِنُ الثَّنَاءُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ ـ بعد از خدا بزرگ توئی قصه مختصر ـ

অর্থ ঃ "তাঁহার প্রশংসা ও বাস্তব মর্যাদার বিবরণ দান সম্ভবই নহে; সংক্ষেপে এতটুকু বলিয়াই ক্ষান্ত করা বাঞ্ছনীয় যে, তিনি খোদা নহেন– খোদার পরের মর্তবাই তাঁহার।

মে'রাজ শরীফের তারিখ

যুগে যুগে মানুষের জ্ঞান-চর্চা ও বিদ্যা-চর্চার ধারা পরিবর্তিত হইয়া থাকে। ইসলামের পূর্বে আরবদের মধ্যে সাহিত্য ও কাব্য ব্যতিরেকে আর কোন জ্ঞান ও বিদ্যা-চর্চার রীতি ছিল না বলিলেই চলে। এমনকি তাহাদের পক্ষে সেই যুগকে জাহেলিয়াত বা অন্ধকার যুগ বলা হইয়া থাকে। তাহারই সংলগ্ন ইসলামের প্রাথমিক যুগ; তখন হইতে আরবের মুসলমানদের মধ্যে জ্ঞান ও বিদ্যাচর্চা পুরাদমে চলিতে আরম্ভ করে, তাঁহারা আল্লাহর বাণী কোরআন এবং হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বর্ণিত বিষয়াবলী তথা হাদীছ কণ্ঠস্থ করত তাহা প্রচারে মনোনিবেশ করেন। তখনকার রীতি ছিল, মূল বিষয়বস্তু ও ঘটনা হৃদয়ঙ্গম করত; সংরক্ষণ করা। ইতিহাসবেত্তাদের রুচিসম্মত প্রত্যেকটি ঘটনার তারিখ, সময় ও স্থান পূর্ণরূপে নির্দিষ্ট করার প্রতি তাঁহাদের লক্ষ্য থাকিত না। তাঁহাদের বিবৃতিতে অনেক বিশেষ বিশেষ ঘটনারও সঠিক কোন তারিখের বর্ণনা দেখা যায় না। তাঁহারা তাহার গুরুত্বও দিতেন না; বস্তুতঃ তাহা মূল বিষয় ও ঘটনার ন্যায় গুরুত্ব পাওয়ার বস্তুও নহে।

পরবর্তী যুগে যখন বিশেষতঃ ঐসব বিষয় ও ঘটনা ইতিহাসরূপে লিপিবদ্ধ হওয়া আরম্ভ হইল, তখন উদ্যোক্তাগণ ইতিহাসবেত্তাদের রুচি ও রীতি অনুসারে ঘটনাবলীর দিন-তারিখ স্থান নির্ধারণে তৎপর হইলেন, কিন্তু মূল ঘটনার বর্ণনাকরীদের হইতে তাহা সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট খোঁজ না পাইয়া নানা প্রকার আকার ইঙ্গিত হইতে ঐসব বিষয় নির্ধারণ করিতে সচেষ্ট হইলেন। সেমতে তাঁহাদের মধ্যে অনেক স্থলে মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছে। সারকথা– অনেক অনেক অকাট্যরূপে প্রমাণিত ঘটনার তারিখ যেমন, "মে'রাজ শরীফের" তারিখ সম্পর্কে সামঞ্জস্যবিহীন মতভেদ দেখা যায়, কিন্তু এই মতভেদ মূল ঘটনার সাক্ষ্যদাতাগণের মধ্যে নহে, বরং মূল ঘটনার সাক্ষীগণ তারিখ বর্ণনা না করায় পরবর্তী যুগের লেখকগণ নিজেদের চেষ্টায় তারিখ বাহির করিতে যাইয়া মতভেদ করিয়াছেন এবং তাহা হওয়াই স্বাভাবিক।

স্থানবিশেষে মূল ঘটনা বর্ণনাকারীদের বিবৃতিতেও ঐসব বিষয় নির্ধারণে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। যেমন– মে'রাজ শরীফের ঘটনায় হযরত (সঃ)-কে কোন্ স্থান হইতে নেওয়া হইয়াছিল, হযরত (সঃ) তখন কোন্ ঘরে বা কোন্ জায়গায় ছিলেন, সে সম্পর্কে বিভিন্ন বিবরণ পাওয়া যায়। কিন্তু পাঠকবৃন্দ! স্মরণ রাখিবেন, মূল ঘটনার বিবৃতিদানকারীদের বর্ণনায় কোন বিষয়ের বিভিন্নতা দেখা যাইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা সামঞ্জস্যবিহীন নহে। মে'রাজ সম্পর্কীয় স্থান সম্পর্কে যে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় তাহার সামঞ্জস্য বিস্তারিত বিবরণে জানিতে পারিবেন।

মে'রাজের তারিখ সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের অনেক মতভেদ আছে। তবে নবুয়তের একাদশ বৎসরে হওয়াই বিশেষ সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হয়। অবশ্য দ্বাদশ বৎসর সম্পর্কেও মতামত পাওয়া যায়। আর মাস ও তারিখ সম্পর্কে প্রসিদ্ধ মত এই যে, রজব মাসের ২৭ তারিখের রাত্রি ছিল। (যোরকানী, ১–২০৮ দ্রষ্টব্য)

এই ধরনের বিষয়াবলীর তারিখ সম্পর্কে তৎপর না হওয়াই ইসলাম ও শরীয়তের দিক দিয়া উত্তম। ছাহাবী ও তাবেয়ীগণও এই সম্পর্কে তৎপরতা দেখান নাই। কারণ তাহাতে বেদআত তথা নানা প্রকার কুসংস্কার সৃষ্টির আশঙ্কা থাকে।

মে'রাজের বিবরণ

মে'রাজ শরীফের ঘটনার বিবরণ স্বয়ং হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মাধ্যমে পাওয়া গিয়াছে। হযরত (সঃ) বিভিন্ন উপলক্ষে বিভিন্ন সময়ে ছাহাবীদের সম্মুখে তাহার বিবরণ দান করিয়াছেন। ঘটনাটি অতি সুদীর্ঘ, সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন বর্ণনাকারীর বর্ণনায় বিভিন্ন অংশ বর্ণিত হইয়াছে এবং বিভিন্ন অংশ উল্লেখবিহীন রহিয়াছে। সকলের বিবৃতি একত্রে দেখিলে মূল ঘটনার অনেকাংশ প্রকাশ পাইয়া যাইবে। মে'রাজ শরীফের বিবরণে ত্রিশ জন ছাহাবীর বর্ণনা বা হাদীছ বর্তমান কিতাবসমূহে পাওয়া গিয়াছে; তন্মধ্যে বোখারী শরীফে সাত জনের হাদীছ রহিয়াছে– যাহার সুশৃঙ্খল উদ্ধৃতি নিম্নে প্রদত্ত হইল।